টাঁড়বাঘোয়া

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

টাঁড়বাঘোয়া

তোমরা কেউ বাড়্কাকানা থেকে চৌপান্ যে রেল লাইনটি চলে গেছে পালামৌর গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেই পথে গেছ কী না জানি না। না-গিয়ে থাকলে একবার যেও। দু'পাশে অমন সুন্দর দৃশ্যের রেলপথ খুব কমই আছে। শাল, মহুয়া, আসন, পন্নন, কেঁদ, পিয়াশাল, চৌওয়া, পলাশ, শিমুল আরও কত কী নাম জানা এবং নাম না-জানা গাছ-গাছালি। ছিপছিপে, ছিমছাম ঝিরঝিরে নদী। মৌন মুনির মত সব মন-ভরা পাহাড়। মাইলের পর মাইল ঢালে, উপত্যকায়, গড়িয়ে-যাওয়া সবুজ জামদানী শালের মত জঙ্গল। এক এক ঋতুতে তাদের এক এক রূপ।

এই রেলপথে লাপ্রা বলে একটি ছোট্ট স্টেশান আছে। তার এক পাশে খিলাড়ি, অন্য পাশে মহুয়ামিলন। মহুয়া-মিলনের পর টোরী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই লাপ্রা স্টেশানটির নাম ছিল আণ্ডা-হল্ট্। ব্রিটিশ টমি আর অ্যামেরিকান সৈন্য ভর্তি মিলিটারী ট্রেন এখানে থামত রোজ ভোরে—প্রাতঃরাশ-এর জন্য।

যখনকার কথা বলছি, তখন তোমরা অনেকেই হয়ত জন্মাওনি। যে সময়কার এবং যে সব জায়গার কথা বলতে বসেছি, সেই সময় এবং সেই সব সুন্দর দিন ও পরিবেশ বিলীয়মান দিগন্তের মতই দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে।

তাই হয়ত মনে থাকতে থাকতে এসব তোমাদের বলে ফেলাই ভাল।

লাপ্‌রার কাছে চট্টি নদী বলে একটি নদী আছে। ভারী সুন্দর নদীটি। পিক্‌নিক করতে যেতেন অনেকে দল বেঁধে। সেই সময় লাপ্‌রাতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা একটি কলোনী করেছিলেন। ফুটফুটে মেয়েরা গোলাপী গাউন পরে, মাথায় টুপী চড়িয়ে গরুর গাড়ি চালিয়ে যেতো লাল ধুলোর পথ বেয়ে, ক্ষেতে চাষ করত, পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সেচ করত সেই জমি। পালামৌর ঐসব রাঁচী অঞ্চলের এমনই মজা ছিল যে, গরমের সময়েও কখনোই রুক্ষ হতো না। প্রায় সব সময়ই সবুজ, ছায়াশীতল থাকত। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিও রাতে পাতলা কম্বল দিতে হতো গায়ে। সন্ধ্যের পর বাইরে বসলে সোয়েটার বা শালের দরকার হতো।

আমি তখন কলেজে পড়ি। ফারস্ট্‌ ইয়ার। কলেজের গরমের ছুটিতে মহুয়ামিলন আর লাপ্‌রার মাঝামাঝি একটি জায়গাতে গিয়ে উঠেছি। সঙ্গে আমার এক সাগরেদ টেড্‌। টেডএর বাবা আমার বাবার সঙ্গে এক অফিসে কাজ করতেন। অস্ট্রিয়াতে টীরল বলে একটি বড় সুন্দর প্রদেশ আছে। সেখানেই তার পৈতৃক নিবাস। কিন্তু তার বাবার সঙ্গে ভারতবর্ষেই টেড ছিল অনেক বছর। জন্মেও ছিল সে এখানে। আমরা দুজনে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলাম! বনে-জঙ্গলে টেডএর সঙ্গে যে কত ঘুরেছি আর শিকার করেছি সেই সময়—সেসব কথা এখন মনে হয় স্বপ্ন।

এখন টেড আছে কানাডাতে। ছোটবেলায় ভারতবর্ষের

জঙ্গলে ঘুরে তার জঙ্গলের নেশা ধরে গেছিল, তাই কানাডার জঙ্গলে বিরাট কাঠের কারবার ফেঁদেছে সে বড় হয়ে। তিন চার বছর অন্তর টেড আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে যায়। টিকিট কেটে পাঠায় ওখান থেকে। কানাডার বনে জঙ্গলে এখন আমিই ওর সাগরেদ হয়ে ঘুরে বেড়াই।

সেদিন বিকেলে, একটা ছোট্ট পাহাড় ছুলোয়া করিয়ে ময়ূর তিতির ও মুরগী উড়িয়েছিলাম আমরা। তবে, খানেওয়ালা মাত্র আমরা দুজন। সঙ্গে আছেন টিরিদাদা। টিরি ওঁরাও। তিনি একাধারে আমাদের অনুচর, বাবুর্চি, গান-বেয়ারার বা বন্দুকবাহক এবং লোকাল গার্জেন। তাই অনেক পাখি উড়লেও তিনজনে দিন-দুই খাওয়ার মত দুটো মোরগ আর দুটো তিতির শুধু মেরেছিলাম আমরা।

ময়ুর মারতাম না কখনও আমাদের কেউই। একবার শুধু, কেমন খেতে লাগে তা দেখবার জন্যে অনেকদিন আগে মেরেছিলাম একটা। তোমরা বোধহয় অনেকেই জানো না, ময়ূরের মাংস হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাদু ও নরম হোয়াইট-মীট।

টিরিদাদা রান্না-টান্না করছে, আমরা বাংলোর বাইরে বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছি। কাল-পরশু সবে অমাবস্যা গেছে। তখনও চাঁদ ওঠেনি, ফুরফুর করে হাওয়া দিয়েছে। মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ ভেসে আসছে সেই হাওয়াতে। অন্ধকার বন থেকে ডিউ-ড্যা-ডু-ইট্ পাখি ডাকছে। কোনো জানোয়ার দেখে থাকবে হয়ত ওরা।

এমন সময় দেখি মশাল জ্বালিয়ে আট দশজন লোক দূরের

পাকদণ্ডী পথ বেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আমাদের বাংলোর দিকেই আসছে।

সন্ধ্যের পর এই জঙ্গুলে জায়গায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউই বড় একটা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয় না। এত লোক এক সঙ্গে কোথা থেকে আসছে সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমরা চেয়ে রইলাম নাচতে-থাকা মশালের আলোগুলোর দিকে।

বিকেলে মুরগী মারার সময় যারা ছুলোয়া করেছিল, তারা মহুয়ামিলনের আশেপাশের বস্তীরই সব ছোট ছেলে। তাদের আমরা এক আনা করে পয়সা দিতাম, তিন-চার ঘণ্টা ছুলোয়ার জন্যে। তখনকার এক আনা অবশ্য এখনকার পাঁচ টাকার সমান। তাই ভীড় করে আসত ওরা ছুলোয়া করার জন্যে। সেদিনই টেঁডের বন্দুকের ছর্‌রাগুলি ঝরঝর করে একটা কেলাউন্দা ঝোপের গায়ে গিয়ে লাগে, তার পাশেই ছিল একটি ছেলে। এমন বোকার মত বেজায়গায় এসে পড়েছিলো ছেলেটা যে, একটু হলে তার গায়েই গুলি লেগে যেত! তার গায়ের পাশে গুলি লাগতে সে অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে মাটিতে বসে ছিল। টিরিদাদা গিয়ে তাকে তুলে ধরে, টিকি নাড়িয়ে তার যে কিছুই হয়নি একথা বুঝিয়ে তার ঠোঁটের ফাঁকে একটু খৈনী দিয়ে দিয়েছিল। অতটুকু ছেলে খৈনী খায় দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছিলাম।

এই লোকগুলো আসছে কেন কে জানে। ছেলেটার গায়ে সত্যি সত্যিই কি গুলি লেগেছিল? শিকারে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন এমন সব ঘটনা ঘটে যে, তখন মনে হয় বন্দুক

রাইফেলে আর জীবনে হাত দেবো না। আমার ছোট ভাই-এর একটা ফুসফুস ত কেটে বাদই দিতে হল! এক বে-আক্কেল সঙ্গীর বে-নজীর বন্দুকের পাখি-মারা-ছর্‌রা তার একটা ফুসফুসকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

সবই জানা আছে। মানাও। তবুঃ কিছুদিন যেতে না যেতেই জঙ্গল আবার হাতছানি দেয়। কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে জঙ্গলের কানাকানি, পাখির ডাক, শম্বরের গভীর রাতের দূরাগত ঢাংক ঢাংক আওয়াজ, চিতাবাঘের গোঙানী। আর নাকে ভেসে আসে জঙ্গলের মিশ্র গন্ধ। ফোটা-কার্তুজের বারুদের গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘুমের মধ্যে, ভীড়ের মধ্যে, পড়াশুনার মধ্যে অশরীরি হাওয়ার মত জঙ্গল যেন হাত বোলায় গায়ে মাথায়। তাই আবারও বেরিয়ে পড়তে হয়। নানারকম বিপদ আছে বলেই হয়ত জঙ্গল এত ভাল লাগে।

লোকগুলো গেট পেরিয়ে বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ে একেবারে কাছে এসে আমাদের সামনে মাটিতে বসে পড়ল। বুঝলাম, অনেক পথ হেঁটে এসেছে ওরা। ওদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সেই শুধু দাঁড়িয়েছিল। সে বলল যে, তারা পলাশবনা বলে একটা গ্রাম থেকে আসছে অনেকখানি হেঁটে। তাদের বস্তীতে একটা মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। গ্রামকে ওরা বলে বস্তী। পনেরো দিন আগে কাঠ কুড়োতে যাওয়া একটি মেয়েকে সেই বাঘে ধরেছিল। ওরা ভেবেছিল যে, বাচ্চা মেয়েটা বুঝি হঠাৎ ভুল করেই গিয়ে পড়েছিল ভীষণ গরমে ক্লান্ত হয়ে-যাওয়া ছায়ায় বিশ্রাম-নেওয়া বাঘের সামনে। কিন্তু আজই বিকেলে গ্রামের

মধ্যে ঢুকে অনেকের চোখের সামনেই কুয়োতলা থেকে আবার একজন বুড়িকে তুলে নিয়ে গেছে বাঘটা। তাই বাঘটা যে মানুষখেকোই সে বিষয়ে তাদের কোনোই সন্দেহ নেই আর!

কথাবার্তা শুনে টিরিদাদা এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের পেছনে।

আমি বললাম, দাঁড়িয়ে দেখছো কি টিরিদাদা? এতদূর থেকে এসেছে ওরা, ওদের প্যাঁড়া দাও, জল খাওয়াও। ওদের জন্যে খাওয়ারও একটু বন্দোবস্ত করো। তুমি ত একা এত লোকের খাবার বানাতে পারবে না! ওদের জল-টল খাওয়া হলে ডেকে নাও ওদের, তারপর সকলে মিলেই হাতে হাতে রুটি বানিয়ে ফেল। নইলে ভাত কর। ঝামেলা কম হবে। মাংস ত আছেই। যা আছে তাতে হয়ে যাবে।

টিরি বলল, নিজের খাওয়া আর সকলের খাওয়া-খাওয়া করেই তুমি মরলে।

টেড হিন্দী বোঝে। বলতেও পারে। টিরিকে বলল, তুম বহত বক্‌বকাতা হ্যায়।

আমি সর্দারকে শুধোলাম, বুড়ির মৃতদেহ কি তোমরা উদ্ধার করতে পেরেছো?

না বাবু. ও বলল।

কেন? সকলে মিলে আলো-টালো নিয়ে গেলে না কেন? গ্রামে কী একটাও বন্দুক নেই?

আছে। টিকায়েতের আছে। তার বিলিতি বন্দুক আছে একনলা। তার কাছে গেছিলামও আমরা। কিন্তু সে বলল, একটা মরা বুড়ির জন্যে রাতবিরেতে নিজের প্রাণ খোয়াতে



রাজী নয় সে। কাল দিনেরবেলা আমাদের গিয়ে দেখে আসতে বলেছে। বুড়ির সবটুকু যদি বাঘ খেয়ে না ফেলে থাকে, তাহলে সেইখানে ভাল বড় গাছ দেখে মাচা বাঁধতে বলেছে আমাদের। সেই মাচায় বসবে বিকেলে গিয়ে। এবং বলেছে বাঘটাকে মারবে।

টেড বলল, তাহলে ত বন্দোবস্ত হয়েই গেছে। তোমরা আমাদের কাছে এই এতখানি পথ ঠেঙ্গিয়ে আসতে গেলে কেন?

সর্দার বলল, এই টিকায়েতই তো গতবছরে নতুন বন্দুক কেনার পর বাঘ মারবে বলে গরমের সময়ে জলের পাশে বসে ছিল। বাঘ যখন জল খেতে এসেছিল, তখন তাকে গুলিও করে বিকেল বেলায়। ঐ ত যত ঝামেলার ঝাড়।

আমি বললাম, খারাপটা সে কি করল তোমাদের?

সর্দার বলল, বাঘটা মারতে পারলে ত হতোই। বাঘ হুঙ্কার ছেড়েই পালিয়ে গেছিল গায়ের গুলি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে।

সর্দার একটু চুপ করে থেকে বলল, কী আর বলব, আজ প্রায় সাত-আট বছর হলো বাঘটা এই অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করত, কারো কোনোই ক্ষতি করত না কখনও, এমন কি গ্রামের গরু-মোষও মারেনি। শুধু টিকায়েতের বেতো-ঘোড়া মেরেছিল একটা।

ওদের মধ্যে একজন সর্দারকে শুধরে দিয়ে বলল, একবার শুধু একটা গাধা মেরেছিল বস্তীর ধোপার।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমাদের মনে

হয় টিকায়েতের ঐ গুলিতে আহত হয়েই, বাঘটার শরীরে জোর কমে গেছে। তাই ত বোধহয় ও আর জঙ্গলের জানোয়ার ধরতে পারে না। সেইজন্যেই এখন মানুষ ধরা আরম্ভ করেছে। ওকে বস্তীর সকলেই চেনে, কারণ পলাশ-বনার ছোট বড় প্রায় সকলেই কখনও না কখনও দেখেছে ওকে।

একটু থেমে বুড়ো সর্দার বলল, আমরা আগে ওকে আদর করে ডাকতাম টাঁড়বাঘোয়া বলে। অনেকে পিলাবাবাও বলত। আমাদের বস্তীর আর জঙ্গলের মধ্যের খোলা টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায়ই সকালে অথবা সন্ধ্যায় ওকে ধীরে সুস্থে যেতে দেখা যেত।

বুড়োর কথা শুনে টেড আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। বিহারের হাজারীবাগ পালামৌ জেলাতে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠকে বলে টাঁড়। টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করত বলেই ওরা টাঁড়বাঘোয়া বলে ডাকত বাঘটাকে। মানে, টাঁড়ের বাঘ। বাঘ সাধারণতঃ ফাঁকা জায়গায় বেরোয় না দিনের বেলা। কিন্তু এ বাঘটা সকাল সন্ধ্যের আলোতে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করত বলেই ওরকম নাম হয়েছিল বোধহয়।

টেড বলল, কত বড় বাঘটা ?

সর্দার বলল, দিখ্‌কে আপকো দিমাগ্‌ খারাপ হো জায়গা হুজৌর। ইত্‌না বড়কা। বলে, নিজের বুকের কাছে হাত তুলে দেখিয়ে বলল।

আমি বললাম, বাঘটাকে পিলাবাবা বলে ডাকত কেন কেউ কেউ, তা বললে না ত ?

বুড়ো বলল, হলুদ রঙের ছিল বাঘটা, ইয়া ইয়া দাড়ি গোঁফওয়ালা, তাই অনেকে বলত পিলাবাবা। হিন্দীতে পিলা মানে হলুদ। বিহারের বাঘের গায়ের রঙ সচরাচর পাটকিলে হয়। টাড়বাঘোয়ার রঙ হলুদ বলেই তার অমন নাম।

টেড জিগগেস করলো, তোমাদের গ্রাম কত মাইল হবে এখান থেকে।

ওরা এবার একসঙ্গে সকলে কথা বলে উঠল।

বলল, জঙ্গলে জঙ্গলে গেলে লাতেহারের দিকে দশ মাইল। পি-ডাব্লু-ডির রাস্তায় গেলে কুড়ি মাইল—তাও রাস্তা ছেড়ে আবার পাঁচ-ছ' মাইল হাঁটতে হবে।

আমি বললাম, তোমাদের গ্রামে আমাদের থাকতে দিতে পারবে ত? কোনো খালি ঘর-টর আছে?

বুড়ির ঘরই ত আছে, ওরা বলল।

তারপর বলল, বুড়ির কেউই ছিল না। এক নাতি ছিল, গত বছরে এমনই এক গরমের দিনে একটা বিরাট কালো গহুমন্ সাপ তাকে কামড়ে দেয়। ওঝা কিছুই করতে পারলো না। মরে গেল সে।

তারপর বলল, আপনারা গেলে আমরা আমাদের নিজেদের ঘরও ছেড়ে দেবো। আপনাদের কোনো কষ্ট দেবো না। দয়া করে চলুন আপনারা মালিক।

কলেজে-পড়া সবে-গোঁফ-ওঠা আমাদের, এমন বার বার মালিক মালিক বলাতে আমাদের খুবই ভালো লাগতে লাগল। বেশ বড় বড় হাব-ভাব দেখাতে লাগলাম। আবার একটুও লজ্জাও করতে লাগল। এখনও নিজেদের মালিকই হতে

পারলাম না, তা এতজন লোকের মালিক! টিরিদাদাকে ডেকে, ওদের সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে বললাম।

ওরা যখন চলে গেল তখন আমি আর টেড পরামর্শ করতে বসলাম।

এর আগে আমাদের দুজনের কেউই কোনো মানুষখেকো বাঘ মারিনি। আমি ত বড় বাঘও মারিনি। টেড অবশ্য মেরেছিল একটা, উড়িষ্যার চাঁদকার জঙ্গলে, যখন ও ক্লাস টেন-এ পড়ে। দিনের বেলা, মাচা থেকে।

টেড অনেকবার আমাকে বলেছে আগে, বাঘটা এমন বিনা ঝামেলায় মরে গেল যে, একটুও মনে হলো না যে বাঘ মারা কঠিন। থ্রি-সেভেনটি-ফাইভ ম্যাগনাম্ রাইফেলের গুলি ঘাড়ে লেগেছিল সাত হাত দূর থেকে। বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়েই ভীষণ কাঁপতে লাগল। মনে হলো, ম্যালেরিয়া হয়েছে, গায়ে কম্বল চাপা দিলেই জ্বর ছেড়ে যাবে। তা নয়, ঘাড়ের ফুটো দিয়ে প্রথমে কালচে, তারপর লাল রক্ত বেরোতে লাগল আর বাঘটা হাত পা টানটান করে ঘুমিয়ে পড়লো। যেন রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ে খুবই ঘুম জমেছিল ওর চোখে। যেন সাধ মিটিয়ে ঘুমোবে এবারে।

টেডের প্রথম বাঘ অমন লক্ষ্মী ছেলের মত মরলেও টেড ও আমি খুব ভালই জানতাম যে বাঘ কী জিনিস! বড় বাঘের সঙ্গে মোলাকাৎ আমাদের বহুবার হয়েছে—জঙ্গলে, পায়ে হেঁটে। যেই না চোখের দিকে তাকিয়েছে বাঘ, অমনি মনে হয়েছে যে, এ্যাডিশনাল ম্যাথমেটিকস্-এর পরীক্ষা যে ভীষণই খারাপ দিয়েছি অথচ কাউকে বাড়িতে সে খবরটা এপর্যন্ত

জানাইনি তাও যেন বাঘটা একমুহূর্তে জেনে গেল। বাঘ চোখের দিকে চাইলেই মনে হয় যে, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে ফেলল।

একে বাঘ। তায় আবার মানুষখেকো!

টেড বলল, বাড়িতে টেলিগ্রাম করে বাবার পারমিশান চাইব? তুইও চা। আফটার অল ম্যানইটার বাঘ বলে কথা।

আমি বললাম, তোর যেমন বুদ্ধি! পারমিশান চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আসবে, কাম ব্যাক্ ইমিডিয়েট্‌লি।

টেড বলল, সেকথা ঠিকই বলেছিস। বাবা-মার পারমিশান নিয়ে কে আর কবে এরকম মহৎ কর্ম করেছে বল।

আমি বললাম, কোনো খারাপ কর্মও কখনও করেনি কেউ, কি বল?

ও বলল, তাও যা বলেছিস।

তারপর বলল, থাকতেন আমার মা বেঁচে! মা দেখতিস রিটার্ন-টেলিগ্রাম করতেন, বাঘের চামড়া না-নিয়ে ফিরলে, তোমারই পিঠের চামড়া তুলব। বাবাও অবশ্য আগে সেরকমই ছিলেন। তবে জানিস ত, মা চলে গেলেন এত অল্প বয়সে, আমার ত আর ভাই-বোন নেই, আমিই একা; বাবা এখন বড় নরম হয়ে গেছেন আমার ব্যাপারে। নইলে বাবা ঠিকই উৎসাহ দিতেন।

আমি বললাম, তোর বাবা-মা ত আর বাঙালী নন। তুই ত রবীন্দ্রনাথ পড়িসনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি।

টেড বলল, আমরা ভীষণ বাজে কথা বলছি। এবার কাজের কথা বল।

বলেই বলল, টস্ করবি?

আমি বললাম, হুস্স্স্। টস্ করা মানেই একজন জিতবে অন্যজন হারবে। হারাহারির মধ্যে আমি নেই। তুইও থাকিস না। আমরা হারতে আসিনি। কখনও হারব না আমরা! জিতবোই। আমরা যাচ্ছি। ডিসাইডেড।

টেড কিছুক্ষণ বাইরের অন্ধকার রাতে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ওর টেনিস-খেলা শক্ত হাতের মধ্যে আমার হাতটা নিয়ে বলল, সো, দ্য পুওর ম্যানইটার ইজ ওলরেডী ডেড।

বলেই হাসল।

আমি ওর হাতটা আমার হাতে ধরে হাসলাম।

বললাম, ইয়েস্। হি ইজ। অ্যাজ ডেড অ্যাজ হ্যাম।

টেড বলল, অ্যাই! হি বললি কেন? বাঘ কী বাঘিনী আমরা ত জানি না এখনও! গিয়েই জানব।

আমি বললাম, ঠিক।

টিরিদাদা এসে বলল, ওদের প্যাঁড়া আর জল খাইয়েছি। রুটি বানানো শুরু হয়ে গেছে। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হবে। ভাত-ফাত খেতে ভালোবাসে না ওরা। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পেট খালি-খালি লাগে নাকি ভাত খেলে।

টিরিদাদাকে উদ্দেশ্য করে টেড বলল, বাঁধা-ছাঁদা করে আমরাও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। আজ রাতারাতিই ওদের গ্রামে পৌঁছতে হবে। বুড়িকে খাওয়ার পরও যে পলাশবনা গ্রামেই মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসে থাকবে বাঘ তার ত কোনো গ্যারান্টি নেই।

টিরিদাদা আপত্তির গলায় বলল, এই রাতে! সাপ-খোপ্ আছে।

আমি বললাম, ভূত প্রেতও আছে টিরিদাদা!

টিরিদাদা বলল, ব্যসস্, ব্যসস্। রাতের বেলা আবার ওদের নাম করা কেন? বড় বেয়াদব হয়েছো।

টেড হাসল। বলল, শোনো টিরি; ওদের সঙ্গে তুমিও খেয়ে নেবে ভাল করে, আর আমাদের খাবারটা এখানেই দিয়ে যেও সকলের খাওয়া হয়ে গেলে।

টিরিদাদা বলল, মোরগ আর তিতিরগুলো সবই কেটে ফেললাম। তারপর এক বালটি পানি আর একগাদা লংকা ফেলে এমন ঝোল বানাচ্ছি যে, যারা তোমাদের প্রাণে মারার জন্যে নিতে এসেছে তাদের প্রাণ আজ আমার হাতেই যাবে। ওদের কারোই বাঘের মুখ অবধি পৌঁছতে হবে না হয়ত আর এই ঝোল খাবার পর।

টেড হাসল।

তারপর বলল, তুমি আজকাল কথা বড় বেশী বকছো, কাজ কম করছো টিরি। যাও, পালাও এখানে থেকে।

টিরিদাদা সত্যি সত্যিই চটে গেছে মনে হলো এবার।

বলল, তোমাদের তুজনের কারোও যদি কিছু হয় তাহলে

আমি তোমাদের বাবাদের কাছে কোন্ জবাবদিহিটা করব, সে কথা একবারও ভেবেছো? সবে কলেজে উঠেছো, এখনও ভালো করে গোঁফ পর্যন্ত ওঠেনি, সব একেবারে লায়েক হয়ে গেছো দেখি তোমরা! লায়েক! কেন যে মরতে আমি এখানে ফেঁসেছিলাম! সঙ্গে এসেছিলাম!

আমি বললাম, আমরা বণ্ড লিখে সই করে দিয়ে যাব যে, আমাদের মৃত্যুর জন্যে টাঁড়বাঘোয়াই দায়ী, টিরিদাদা দায়ী নয়।

টাঁড়বাঘোয়া? সেটা আবার কি?

টিরিদাদা কাঁচা পাকা ভুরু তুলে শুধোলো।

টেড বলল, বাঘটার নাম গো, বাঘটার নাম। এত বড় বাঘ যে, দেখলে নাকি দিমাগ্ই খারাপ হয়ে যাবে।

টিরিদাদা বলল, আমার দিমাগ বাঘ না দেখেই খারাপ হচ্ছে। ভাল লাগছে না একটুও। আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছে না। কী বিপদেই যে পড়লাম!

॥ ২ ॥

পলাশবনা গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই আমাদের ঘণ্টা আড়াই লেগে গেল। ইচ্ছে করেই মহুয়ামিলনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নিয়ে আমরা রাত দেড়টা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়েছিলাম যাতে ভোর ভোর এসে পলাশবনাতে পৌঁছাতে পারি।

পথের এক জায়গায় একটা বেশ উঁচু এবং গভীর জঙ্গলে ভরা পাহাড় আছে। তার গায়ে ন্যাড়া চ্যাটালো কালো পাথরের চাঙ্গড়। অনেকগুলো বড় বড় গুহা। সবে ওঠা একটু চাঁদের আলোয় গরমের শেষ রাতের হাওয়ায় দোলাদুলি করা ডাল-পালার ছায়ায় পাহাড়টাকে ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছিল।

টিরিদাদা এখানে এসেই আমাদের একেবারে গায়ে গায়ে সেঁটে চলতে লাগলো।

টেড বলল, কি হলো টিরিদাদা? ভয় পেও না। আমারও মন বলছে, এখানে ভূত নিশ্চয়ই আছে।

টিরিদাদা প্রচণ্ড রেগে উঠল। এবং সঙ্গের দু-একজন ওর সঙ্গে তাল মেলাল।

বলল, রাতের বেলায় বনপাহাড়ে ওসব দেবতাদের নিয়ে রসিকতা একেবারেই করতে নেই। ওরা ঐসব দেবতাদের ভালো করেই জানে, তাই ভয় পায়। বন্দুক দিয়ে ত আর

ওঁদের মারা যাবে না।

টেড চুপ করে গেল।

হঠাৎ আমাদের সামনের অল্প চাঁদের আলোয় মাখামাখি ভুতুড়ে পাহাড়তলী থেকে একটা আওয়াজ উঠল উঁ-আঁউ। পাহাড়ের আনাচ-কানাচ, উপত্যকা সব সেই আওয়াজে গম্‌গম্‌ করে উঠল।

লোকগুলো সব ঘন হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল আমাদের পেছনে।

বুড়ো সর্দার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, টাঁড়বাঘোয়া।

সে বাঘের গলার আওয়াজ এত জোরালো এবং এমন গম্ভীর এবং যার আওয়াজ শুনেই তলপেটের কাছে ব্যথা ব্যথা লাগছিল, তাই তার চেহারাটা ঠিক কীরকম হবে তা অনুমান করে আমি মোটেই খুশি হলাম না।

টেড কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল সেই দিকে চেয়ে থেকে বিড় বিড় করে কী যেন বলল।

বাঘটা আরেকবার ডাকল।

একটু পরই একটা কোটরা হরিণ আর একদল মেয়ে শম্বর জঙ্গলে ডানদিকে দৌড়তে দৌড়তে ডাকতে ডাকতে চলে গেল। তাতে বুঝলাম, বাঘটা আমাদের পথ থেকে অনেক ডানদিকে সরে যাচ্ছে।

মশালগুলো জোর করে নিয়ে ওরা আবার এগোলো। আমি আর টেড রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলি লোড করে নিলাম। উঁচু-নীচু পথে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে চেম্বারে গুলি

থাকলে, তাই চেম্বার ফাঁকাই রাখলাম। ভাবলাম, বাঘ কী অত সহজে দেখা দেবে আমাদের।

·যখন আমরা পলাশবনা গ্রামের সীমানায় কাঁটা-গাছের বেড়া দেওয়া অনেক ক্ষেত-খামার আর জটাজুট-সম্বলিত বড় অশথগাছের নিচের বনদেবতার থান পেরিয়ে গ্রামের দিকে এগোতে লাগলাম তখন একজনের বাড়ির উঠোনের কাঠের বেড়ায় বসে, গলা-ফুলিয়ে একটা সাদা বড়্কা মোরগ কঁকর-কঁ-অঅ করে ডেকে উঠে রাত পোহানোর খবর পৌঁছে দিল দিকে দিকে।

পলাশবনাতে পৌঁছতেই খবর পাওয়া গেল যে, টিকায়েত খুবই চটে গেছে গাঁয়ের লোকদের উপরে। সে বাঘ মেরে দেবে বলা সত্ত্বেও তাকে না-বলে-কয়ে তারা যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তাতে তার সম্মানে লেগেছিল। টিকায়েত খবর দিয়ে রেখেছিল যে, তার সঙ্গে দেখা না করে যেন আমরা জঙ্গলে না-ঢুকি। কারণ, এই গ্রামের মালিক সেইই।

এই টিকায়েতেরও অন্য সব টিকায়েতেরই মত অনেক জমি-জমা, গাই-বলদ, মোষ, প্রজা, লেঠেল ইত্যাদি ছিল। সাধারণ গরীব মানুষদের উপর এদের প্রতিপত্তি ও অত্যাচার যাঁরা নিজের চোখে না দেখেছেন তাঁরা বিশ্বাসও করতে পারবেন না।

যাইই হোক, টেড আমার দিকে তাকাল, আমি টেডের দিকে। আগে টিকায়েতকেই মারব, না বাঘ মারব ঠিক করে উঠতে পারলাম না আমরা।

টিকায়েত একজন লেঠেল পাঠিয়েছিলো। সাড়ে ছ'ফিট লম্বা সেই পালোয়ান সাত ফিট লম্বা লাঠি হাতে যখন জঙ্গল



যে, আমাদের এখন টিকায়েতের সঙ্গে দেখা করার একেবারেই সময় নেই ; আমরা আগে বুড়ির মৃতদেহের খোঁজেই যাচ্ছি ; তখন খুবই অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল সে, টিকায়েতকে আমাদের দুঃসাহসের খবরটা দিতে।

টিরিদাদার উপর মালপত্রের জিম্মা দিয়ে, বুড়ির ঘর কিংবা অন্য যে কোনো খোলামেলা একটা ঘর গ্রামের এক প্রান্তে যাতে পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে বলে দুজন স্থানীয় যুবকের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমেই এলাম কুয়োতলায়। বুড়ির মাটির কলসীটা ভেঙে পড়ে ছিল তখনও। যুবক দুটি বুড়িকে মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ দেখে দেখে এগোতে লাগল। প্রথমে অবশ্য একটুও দাগ ছিল না টেনে নেওয়ার। বুড়ির ঘাড় আর কাঁধ কামড়ে ধরে প্রকাণ্ড বাঘটা প্রায় তাকে শূন্যে তুলেই নিয়ে গেছে অনেকখানি।

বাঘটা যে কত বড় তা তার পায়ের দাগ দেখেই বোঝা গেল। দশ ফিটের মত হবে বলে মনে হলো আমার ও টেডের। বেশীও হতে পারে। অবশ্য, ওভার দ্য কার্ভস্ মাপলে। বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখে আমারও রীতিমত ভয়ই করতে লাগল। টেডএরও নিশ্চয়ই করছিল। কিন্তু কে যে বেশী ভয় পেয়েছি তা তক্ষুনি বোঝা গেল না। পরে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

শাল জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর নিয়ে গিয়েই বুড়ির সাদা থানটাকে খুলে ফেলেছে বাঘ। রক্তমাখা, তখনও সপ্‌সপে কাপড়টা ওরা তুলে নিল। দেখা গেল, বাঘটা বুড়িকে কতগুলো

পুটুস্ আর আনারসের মত দেখতে মোরব্বার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে। সেই জায়গাটা পেরিয়ে এক টুকরো হরজাই জঙ্গলে ঢুকে, সেই জঙ্গলও পেরিয়ে একটা কালো পাথরের বড় টিলার পাশে, কতগুলো ঢোণ্ডটা, ঢোটর আর পলাশ গাছের মধ্যে ঢুকে নীচের পুটুস্ আর শালের চারার মধ্যে মৃতদেহটাকে লুকিয়ে রেখেছে।

প্রায় সবটাই খেয়ে গেছে। আছে শুধু একটা পা আর মাথার খুলি। চুলগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। দেখেই আমাদের গা-গোলাতে লাগল। সেইই প্রথম মানুষখেকো বাঘে-খাওয়া মানুষের মড়ি দেখলাম আমি আর টেড।

চারদিক দেখে-টেখে মনে হলো, বাঘ এখন কাছাকাছি নেই। নেই যে তা বোঝা গেল পাখিদের এবং নানা জানোয়ারের ব্যবহারে। কাছাকাছি মাচা বাঁধার মত কোন গাছও দেখলাম না ভাল। পলাশ গাছগুলো ছোট ছোট ছিল, তাছাড়া ঐ গাছগুলোর নীচের দিকটা ন্যাড়া হয়। গরমের সময় ত পাতাও থাকে না মোটে। শুধুই ফুল। লালে লাল হয়ে আছে চারদিক। ঢোণ্ডটা ও ঢোটরগুলোও তথৈবচ। তার চেয়ে ঐ বড় কালো টিলাটাতে বসলে কেমন হয় সে কথা আমি আর টেড সেই দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবছি, ঠিক সেই সময়ই একটা শম্বর ভীষণ ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে টিলাটার পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আমাদের একেবারে পাশ দিয়ে জোরে দৌড়ে চলে গেল খুরে খুরে পাথরের ঠকাঠক্ শব্দ করে।

ব্যাপারটা কি যখন তা বোঝার চেষ্টা করছি তখনই গোটা দশেক জংলী কুকুর টিলাটার পাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়েই শম্বরটাকে লাফাতে লাফাতে ধাওয়া করে নিয়ে চলে গেল।

'রাজকোঁয়া, রাজকোঁয়া!' বলে চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গের যুবক দুটি।

টেড ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করতে বলল ওদের।

তারপর ওদের গাছে উঠে, বসে থাকতে বলে, আমি আর টেড দুজনে দুদিকে চলে গেলাম, টিলাটাকে ভাল করে দেখার জন্যে। রাতে কোথায় বসা যায়, এবং আদৌ বসা যায় কি-না তা খুব সাবধানে খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের। সন্ধ্যের পর এই কালো পাথরের টিলার চারপাশে কালো কালো ছায়া পাথরের মতোই চেপে বসবে। কোনোদিকেই কিছু দেখা যাবে না। এবং বাঘ যদি আসে তবে শুধু শব্দ শুনেই তার গতিবিধি ঠিক করতে হবে। জায়গাটা এমন যে, চাঁদ উঠলেও ছায়ারা দলে আরো ভারী হবে।

আমরা দুজনে টিলার দুদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সাবধানে। রাইফেলের সেফটি-ক্যাচে আঙুল রেখে। এখন আর একে অন্যকে দেখা যাচ্ছে না। কতগুলো ছাতার পাখি ডাকছে। উড়ছে। বসছে। বুড়ির দুর্গন্ধ শরীরেও একরাশ পোকা উড়ছে বসছে। একঝাঁক টিয়া হঠাৎ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল গ্রীষ্ম-সকালের শান্ত সমাহিত ভাবটা একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে।

আমি আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম টিলাটার উপরে।

টেড়কে আমি দেখতে পাচ্ছি না। ও নিশ্চয়ই অন্য দিক দিয়ে উঠেছে। টিলাটার উপরে একটা গুহা। এবং সেই গুহার ঠিক সামনে পাথরের উপর বাঘের ময়লা পড়ে আছে দেখতে পেলাম। খুব বেশী পুরোনো নয়। তিন চার দিনের হতে পারে, বেশী হলে।

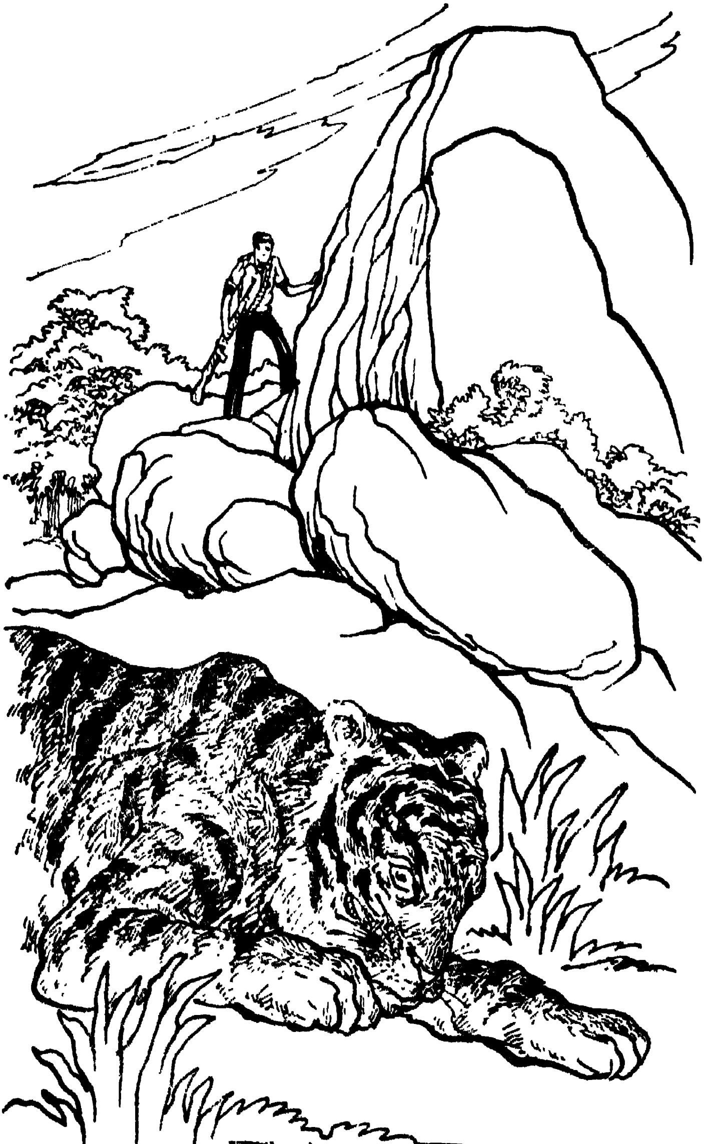
তবে কি টাঁড়বাঘোয়া এখন এই গুহার মধ্যেই বিশ্রাম নিচ্ছে?

গুহার মুখে একটুও ধুলো বালি নেই যে, বাঘের পায়ের দাগ পড়েছে কিনা তা দেখব! রাইফেলটা লক্ করে সেফটি-ক্যাচটা তুলে রাখলাম। প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মধ্যে যাতে সেফটি-ক্যাচকে ঠেলে সরানো যেতে পারে।

গুহার মুখের একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি, গুহার মধ্যে ঢোকা ঠিক হবে কি হবে না; হঠাৎ এমন সময় মনে হলো আমার পিছন থেকে কে যেন আমাকে এক-দৃষ্টিতে দেখছে। প্রত্যেক শিকারীই জানেন যে, বনে-জঙ্গলে এরকম মনে হয়। একেই হয়ত বলে শিকারীদের সিক্সথ-সেন্স্। মনে হতেই, ঘুরে দাঁড়ালাম আমি রাইফেলসুদ্ধ।

ঘুরে দাঁড়ালাম বটে কিন্তু দেরী হয়ে গেল।

হয়ত আমাদের তুজনেরই। একটা প্রকাণ্ড হলুদ-রঙা বাঘের দাড়ি-গোঁফওয়ালা মুখ মুহূর্তের জন্যে গোল কালো পাথরের উপর দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি পাথর টপ্‌কিয়ে টপ্‌কিয়ে ঐদিকে এগোতে লাগলাম টিলাটাকে ঘুরে ঘুরে। বাঘটা যেখানে ছিল সেখান থেকে একলাফেই আমার ঘাড়ে পড়তে পারত। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখান



থেকে বাঘের কাছে পৌঁছতে হলে অনেকখানি ঘুরেই যেতে হবে অনেকগুলো পাথর ডিঙ্গিয়ে ও গহ্বর এড়িয়ে।

হঠাৎই আমার টেডএর কথা মনে হলো।

আমি শিকারের আইন ভেঙ্গে চেঁচিয়ে বললাম, টেড, ওয়াচ-আউট। দ্য ম্যানইটার ইজ এ্যারাউণ্ড।

টেড সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো দূর থেকে, আই নো।

যখন বাঘটার জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি রাইফেল বাগিয়ে, তখন টিলার পশ্চিমদিকের ঝাঁটি জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে একটা ভারী জানোয়ারের দ্রুত চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল ঝরে-পড়া শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে।

সেইদিকে চেয়ে আওয়াজটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। দূরে যেতে যেতে আওয়াজটা একটা ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ী নালার মধ্যে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি নেমে এলাম সাবধানে টিলা থেকে। গাছে-বসা একটা লোককে জিগগেস করলাম, টিলার উপর থেকে গুহার মুখটি সে দেখতে পাচ্ছে কী না?

সে বলল, পাচ্ছে।

আমি বললাম, গুহার ঐ মুখটার দিকে নজর রাখতে। কিছু দেখলেই যেন চেঁচিয়ে আমাকে বলে।

ও বলল, আচ্ছা।

নেমে দেখি, টেড খুব মনোযোগ দিয়ে মাটিতে কী যেন দেখছে।

আমি যেতেই, আমাকে দেখাল। টিলার নিচে, মাটিতে এক জোড়া বাঘের পায়ের দাগ। টাঁড়বাঘোয়ার দাগ এবং

একটি বাঘিনীর পায়ের দাগ। বাঘিনী টাঁড়বাঘোয়ার চেয়ে ছোট।

এরপর আমরা দুজনে সাবধানে টিলাটার চারদিকে একবার ঘুরলাম আরও দাগ আছে কিনা দেখার জন্যে। টিলার পশ্চিম দিকে, যেদিকে আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে শুনেছিলাম একটু আগে, সেই দিকে মাটিতে অনেক পায়ের দাগ দেখলাম বাঘ ও বাঘিনীর। তিন-চারদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল, নরম মাটিতে দাগগুলো স্পষ্ট।

আমরা মহা সমস্যায় পড়লাম।

ফিরে এলাম আবার বুড়ির দেহ যেখানে পড়েছিল সেখানে। যে-লোকটা গুহার মুখে পাহারা দিচ্ছিল তাকে বসিয়ে রেখে, গাছের অন্য লোকটাকে নেমে আসতে বলল টেড।

সে নামলে, তাকে দ্বিতীয় বাঘের কথা জিজ্ঞেস করল ও।

ওরা ত আকাশ থেকে পড়ল। গ্রামের যত লোক নানান কাজে প্রত্যেকদিন জঙ্গলে আসছে তাদের মধ্যে কেউই এক টাঁড়বাঘোয়া ছাড়া অন্য কোনো বাঘকে দেখেনি। পায়ের দাগও দেখেনি। এই গ্রামে আশে-পাশে কখনও কোনো চিতাবাঘও দেখেনি ওরা। হয়ত তার কারণ টাঁড়বাঘোয়াই। তার মত পাহারাদার থাকতে কোনো চিতাবাঘেরই এখানে এসে ওস্তাদী করার সাহস হয়নি।

ইতিমধ্যে চারজন লোক হৈ হৈ করতে করতে দড়ি আর একটা চৌপাই মাথায় করে এসে হাজির। তারা বলল যে,

তারা টিকায়েতের লোক। টিকায়েত রাতে এখানে মাচা করে বসবে, তাই মাচা বাঁধতে পাঠিয়েছে।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলল, আপনারা কিন্তু বাঘের গায়ে গুলি-টুলি করবেন না। করমচারীয়া আপনাদের খুঁজছে। আপনাদের খুবই বিপদ হবে টিকায়েতের কথা না শুনলে।

করমচারীয়া, জানা কথা, টিকায়েতেরই লোক। কিন্তু সে আমাদের খুঁজলেই ত আমরা যাব না তার কাছে।

টেঁড বলল, টিকায়েতের পোষা বাঁদর নই আমরা।

আমাদের সঙ্গের যুবক দুটি টেঁডএর কথাতে হেসে উঠল।

তাতে টিকায়েতের লোকগুলো আরো চটে গেল।

গাছের উপর থেকে অন্য লোকটিও নিচে নেমে এলে আমি টিকায়েতের লোকদের বললাম, মাচা কোথায় বাঁধবে?

ওরা বলল, যে গাছে সুবিধে মত বাঁধা যায়।

কিন্তু টিকায়েতকে গিয়ে বল যে, এখানে দু' দুটো বাঘ আছে। একনলা শট্‌গান নিয়ে তার পক্ষে এই দু' দুটি বাঘের মোকাবিলা করা কি সম্ভব হবে? তার প্রাণের ভয় নেই?

টেঁড বলল, টিকায়েতকে গিয়ে বলো, আমরা সকলে মিলেই একসঙ্গে বাঘ দুটি মারার চেষ্টা করি।

ওরা ভাবল, ঠাট্টা করছি।

তখন টেঁড তাদের নিয়ে গিয়ে পায়ের দাগ দেখালো ভালো করে, বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা কী!

দুটো বাঘের পায়ের দাগ দেখে লোকগুলো ফ্যাসাদে পড়ল। তারপর রাইফেল-হাতে আমরা ঐ জায়গা ছেড়ে চলে

যাচ্ছি দেখে ওরাও বোধহয় খালি হাতে ঐ অকুস্থলে থাকা নিরাপদ নয় ভাবলো।

আমরা একটু এগোতেই দেখি উপুড়-করা খাটিয়া মাথার উপর নিয়ে পিছন পিছন আসছে পুরো দল বড় বড় পা-ফেলে।

টেড বলল, চল্ আমরা ফিরে যাই। এখানে দেখছি টিকায়েতকেই আগে মারতে হবে, তারপর বাঘ মারার বন্দোবস্ত। এতরকম কমপ্লিকেশান, এত জনের এত মত নিয়ে মানুষখেকো বাঘ মারা যায় না।

আমি বললাম, যা বলেছিস্!

গ্রাম থেকে আমরা প্রায় মাইলখানেক এসেছিলাম। বুড়ির ঘরে নয়। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের জন্যে দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছে ওরা! গোবর দিয়ে উঠোন লেপে দিয়েছে। ঘরের ভিতরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু গরমের মধ্যে জানালাহীন ঐ ঘরে কী করে শোব রাতে তাইই ভাবছিলাম।

টিরিদাদা চা করে ব্রেকফাষ্ট তৈরী করে ফেলল, আমাদের দেখেই।

মুড়ি ভাজা। তার মধ্যে কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা কেটে মুড়ির সঙ্গেই ভেজেছে। তারপর তার মধ্যে ওমলেট কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়ে দিয়েছে। গ্রামের গাছের ল্যাংড়া আম। আর কফি।

ঘর দুটোর পাশে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল। তার তলায় চৌপাই বিছিয়ে আমি লম্বা হয়ে শুলাম। আর

সাহেব মানুষ টেড, ঘটিতে জল নিয়ে ফসা-ফর্সা ঠ্যাং বের করে লাল গামছা পরে জঙ্গলে গেল। যারা জঙ্গলে যাওয়া-আসা করে প্রত্যেকেরই অভ্যেস থাকে।

তেঁতুলতলার ফুরফুরে হাওয়াতে আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ শোরগোল শুনে তাকিয়ে দেখি ভাগলপুরী সিল্কের পাঞ্জাবী আর লোম-ওয়ালা গোবদা গোবদা পা-দেখানো মিলের ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা, সোনার হাত-ঘড়ি হাতে, চক্‌চকে কালো নাগরা পায়ে একজন মস্ত লম্বা-চওড়া লোক একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে আর তার পিছনে কুড়ি-পঁচিশজন লাঠিধারী ষণ্ডা-মার্কা লোক।

আমি আরামের ঘুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি চৌপাইতে উঠে বসলাম।

ঠিক আমার সামনে এসে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ে ধমক দিয়ে শুধোলো, আপ্‌কী শুভ্‌ নাম?

আমি নাম বললাম। সবিনয়ে।

টিকায়েত বলল, তাঁর এলাকাতে এসব তিনি সহ্য করবেন না। এই পলাশবনা গ্রামে সব কিছু তাঁর ইচ্ছামতই হয়েছে এযাবৎ এবং হবে চিরদিন।

ভাবছিলাম, এতবড় একটা বিপদ! কোনদিন বাঘ কাকে নেয় তার ঠিক নেই। তারপর আজ দেখা গেল জোড়া বাঘ। গ্রামের গরীব লোকগুলো এতদূর থেকে আমাদের ডেকে নিয়ে এলো আর যে গ্রামের মালিক, মাথা, তারই কী না এই ব্যবহার?

লোকটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আমি বসেছিলাম।

এমন লোককে কিছুই বলার নেই।

এমন সময় টেডকে আসতে দেখা গেল।

টিকায়েতের মুখ দেখে মনে হলো, এমন সাহেব টিকায়েত বাপের জন্মেও দেখেনি। টকটকে গায়ের রঙ, মাথাভরা বাদামী চুল, খালি গা, পায়ে চটি, লাল গামছা পরে সাহেব ঘটি হাতে টাঁড় থেকে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে আসছে।

টেড এসেই বলল, এখানে ভীড় কিসের ?

তখনও ত দেশ স্বাধীন হয়নি। সাদা চামড়া দেখলেই লোকে বেশ সমীহ করত। কিন্তু এই রকম গামছা-পরা সাহেবকে সমীহ করা ঠিক হবে কী না, একটু ভাবল টিকায়েত। তারপর নিজের লোকদের সামনে ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে বলল, আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

টেড বলল, সে কথা ভেবে দেখব। কিন্তু এখুনি আপনার একজন লোক দিন আমাকে। আমি এস-ডি-ও সাহেবের কাছে চিঠি পাঠাবো, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে এই বাঘকে 'ম্যান-ইটার' ডিক্লেয়ার করার জন্যে এবং চার পাশের সব গ্রামের মানুষদের ঢেঁড়া পিটিয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে।

টিকায়েত, টেডএর হর্তাকর্তার মত কথা শুনে হকচকিয়ে গেল বলে মনে হল।

আমি বললাম, ঘোড়া থেকে নামা হোক। আপনার রাজত্বে এলাম, আপনাদেরই উপকার করার জন্যে, তা আপনিই শত্রুর মত ব্যবহার করছেন !

তারপর বললাম, দয়া করে নামুন, বাঘটার খবরাখবর দিন আমাদের। বাঘও ত আপনার প্রজা। আপনি তার খোঁজ না রাখলে, আর কে রাখবে?

টিকায়েত ঘোড়া থেকে নামল।

আমি বললাম, আপনার বন্দুকটা কোথায়? শুনেছি দারুণ দামী বিলিতি বন্দুক। আমাদের একবার দেখান। নেড়ে-চেড়ে দেখি অন্ততঃ একটু।

টেড আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর ইংরিজীতে বলল, কী ব্যাপার? অত গ্যাস দিচ্ছিস কেন?

আমিও ইংরিজীতে বললাম, মিষ্টি কথা বলতে ত পয়সা লাগে না। দ্যাখ-না, ওঁকে বন্ধু করে ফেলছি।

টেড বলল, যেমন তুই! তোর বন্ধুও ত তেমনই হবে!

টেড জামাকাপড় পরে আসতে গেল।

টিকায়েত এসে চৌপাইতে বসল।

লোকটার বয়স আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। চল্লিশ-টল্লিশ হবে। শুনলাম, তার এগারোটা ছেলে-মেয়ে, পাঁচশ বিঘা জমি, দেড়শো গরু-মোষ। জঙ্গলের মধ্যে ভাণ্ডার। বিহারের গ্রামে-জঙ্গলে ক্ষেত-খামার দেখাশোনার জন্যে মাটির বাড়ি করে এরা, তার মধ্যে গুদামটুদামও থাকে। ওরা বলে ভাণ্ডার।

টিকায়েত একটা লোককে ডেকে কী বলল। সে আরো দুজনকে সঙ্গে করে দৌড়ে চলে গেল।

আমি টিরিদাদাকে বললাম, চা করে খাওয়াও

টিকায়েত সাহেবকে।

ইতিমধ্যে টেড জামা-কাপড় পরে এলো। এবার ওকে পুরোদস্তুর সাহেব-সাহেব দেখাতে লাগল। টিকায়েতের ভক্তিও পুরো হল। হাব-ভাবও একটু নরম হলো।

বলল, আপনারা এই ঘরে কী থাকবেন? আমার বাড়ি চলুন নয়ত ভাণ্ডারে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। খাঁটি গাওয়া ঘি-এর পরোটা, হরিণের মাংসর আচার, ক্ষেতের ছোলার ডাল, আর তার সঙ্গে খরগোশের এবং শম্বরের মাংস খাওয়াব।

তারপর বলল, নীলগাই এখানে এত যে, ক্ষেত-খামারই করা যায় না। আমরা যে হিন্দু, তাই নীলগাই আমরা মারি না। গো-হত্যা হবে।

ওদের বুঝিয়ে লাভ নেই যে, নীল গাইএর নামই নীল গাই, কিন্তু তারা মোটেই গরু নয়। একরকমের এন্টেলোপ। এবং এরাই এবং বাঁদর-হনুমানই সবচেয়ে ক্ষতি করে ফসলের। কিন্তু গ্রামের লোকের কুসংস্কারের জন্যে নীলগাই আর বাঁদর হনুমান মারে না আমাদের দেশে। নীলগাইকে খুব একটা মজার নামে ডাকে এরা। বলে, ঘোড়ফরাস্। নামটা শুনলেই আমার বুক ধড়ফরাস্।

টিরিদাদা চা আর হান্টলি-পামারের বিস্কিট এনে দিল টিকায়েতকে। টিকায়েত যখন প্রীত হয়ে চা খাচ্ছে, তখন যে লোকগুলো চলে গেছিল তারা এক গাদা মাঠরী আর প্যাঁড়া নিয়ে এলো। নিশ্চয়ই টিকায়েতের বাড়ি থেকে।

টিকায়েত বলল, খেয়ে দেখুন। সব বাড়ির তৈরী। অসুখ হবার ভয় নেই। মাঠরী খাঁটি ঘি-এ এবং বাড়ির জাঁতায়-পেষা

ময়দা দিয়ে তৈরী।

টিকায়েতের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতেই পারছিলাম যে, ঘি সত্যিই খুব খাঁটি। চা খেতে খেতে টিকায়েতকে বললাম, তাহলে বাঘটাকে কী করা যাবে?

টিকায়েত বলল, চলুন না আমরা তিনজনেই বসি আজ। শুনলাম যে, টিলা আছে ওখানে একটা। ঐ টিলাতেই তিনজনে তিন জায়গায় বসে থাকব।

টেড আমাকে ইংরিজীতে বলল, তুই যাত্রাপার্টিতে কবে নাম লেখালি? ম্যান-ইটার মারতে তাহলে সঙ্গে তবলচী, সারেঙ্গীওয়ালাকেও নিয়ে যা!

আমি টিকায়েতকে বললাম, ঐ টিলাতে বসা খুবই বিপজ্জনক। চাঁদ নেই এখন। আর বাঘ ত অমনি বাঘ নয়; মানুষখেকো। কখন যে নিঃশব্দে এসে কাঁক্ করে ঘাড় কামড়ে নিয়ে যাবে বোঝার আগেই, তারও ঠিক নেই। তাতে আবার তুটি।

টিকায়েতের মুখে এক তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। বলল, আপনারা তাহলে খুব বাঘ মারবেন। বাঘ মারতে সাহস লাগে।

বলেই, তাচ্ছিল্যের চোখে তাকিয়ে আবার বলল, ইয়ে বাচ্চোঁকা কাম নেহী।

আমি বললাম, তা লাগে। কিন্তু গোঁয়ার্তুমি আর সাহস এক কথা নয়। মানুষখেকো বাঘ মারতে বোকা-বোকা সাহসের চেয়ে বুদ্ধি আর ধৈর্য অনেক বেশী লাগে।

টিকায়েত বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, যা বোঝার তা

বুঝেছি। আপনাদের মত বাচ্চা ছেলেদের কর্ম নয় এই বাঘ মারা।

তারপরই বলল, বাজীই লাগান একটা তাহলে।

আমার খুব রাগ হল আমাদের বাচ্চা বলাতে।

টেড বলল, বাজী কিসের?

বাঘ কে মারবে? বাঘ মারার বাজী।

আমি বললাম, বাঘ মরলেই হল। কে মারে সেটা অবান্তর।

টিকায়েত আবার বলল, বুঝেছি। ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর আবার বলল, বলুন কি বাজী? সাহস আছে? কি হল? বাজী ধরারও সাহস নেই?

টেড হঠাৎ বলল, বাজী একটা রাখা যাক। কিন্তু অন্য বাজী। বাঘ আগে আপনাকে খাবে, না আমাদের খাবে? আমাদের ত এখানে কেউই নেই। আমার বন্ধুকে খেলে তাকে ভালোভাবে সৎকার করবেন। আর আমাকে খেলে, জঙ্গলের মধ্যে একটা সুন্দর ফুল গাছের নিচে ছায়াওয়ালা জায়গায় কবর দেবেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে লোকজনদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, আর আপনি মরলে, আমরা দাঁড়িয়ে থেকে আপনাকে দাহ করার বন্দোবস্ত করব। নদীর পারে।

টিকায়েত বেজায় চটল। বলল, বুঝেছি।

টেড আবার বলল, কি হল? বাজীর?

টিকায়েত বলল, আপনাদের বাজীর মধ্যে আমি নেই।

আমি একাই বসব আজ বাঘের জন্যে।

আমি বললাম, বসেনই যদি, তাহলে টিলায় বসবেন না, আমার অনুরোধ।

ভেবে দেখবো।

টেড বলল, একজন লোক দিন, যাতে দিনে দিনে এস-ডি-ওর কাছে যেতে পারে। এস-ডি-ও আবার ডি-এমকে জানাবেন তবে ত ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ার করতে পারবেন।

লোকের কী অভাব? লোক দিয়ে দিচ্ছি দেড়-বোঝা। আপনি চিঠি লিখে দিন।

টিকায়েত বলল।

টেড টিরিদাদাকে কাগজ আনতে বলল।

টিরিদাদা কাগজ আনলে চিঠি লিখে নিজে সই করল, আমাকেও সই করতে বলল। টিকায়েতকে বলল সই করতে গ্রামের লোকেদের হয়ে।

টিকায়েত লেখাপড়া জানে না। ডানহাতের ইয়া মোট্‌কা বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে টিপসই দিলে সে।

তারপরেই উঠে পড়ে বলল, আমি যাই। মাচা বাঁধার বন্দোবস্ত করি গিয়ে।

টেড বলল, তা যান। আমরা আজ খুব ঘুমোব। কাল আপনাকে দাহ করতে অনেক মেহনত হবে ত! যা ঘি আছে আপনার শরীরে! পুড়তে অনেক সময় লাগবে।

টিকায়েত হাসি হাসি মুখে বলল, চলি।

বলেই, ঘোড়ার দিকে এগোতে গেল।

টেড বলল, একটু দাঁড়ান। আপনিই ত গত বছরে

বাঘটাকে গুলি করেছিলেন। কোথায় লেগেছিল গুলি? আপনি কী জানতেন না যে, গরমে যখন পিপাসার্ত জানোয়াররা জল খেতে আসে তখন তাদের ঐভাবে মারা বে-আইনী?

টিকায়েত হেসে বলল, জঙ্গলে আবার আইন কি? আমার এখানে আইন আমি বানাই। আমি যা করি, তাইই আইন। আমারই আইন, আমি ইচ্ছেমতই ভাঙতে পারি। তার জন্যে কারো কাছে জবাবদিহি করতে রাজী নই। সে রকম বাপের ব্যাটা নই আমি। জান্‌ভি যায়গা তব্‌ভি নেহী! কভ্‌ভি নেহী।

তা ভাল। টেড বলল, কিন্তু বাঘটাকে আহত করে আপনিই ত বুড়ি আর মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী হলেন। আপনাকে আপনার প্রজারা খুনের দায়ে দায়ী করতে পারে। করছেও হয়ত মনে মনে।

টিকায়েত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, দেখুন, আপনাদের সঙ্গে ফাল্‌তু কথা বলার সময় আমার নেই। আমার রাজত্বে আপনারা অতিথি, তাই ভাল ব্যবহার করছি। আমি দিগা টিকায়েতের বেটা। আমার বাবা ডাকাত ছিল। তার ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। আমাকে আপনারা ভয় দেখাবেন না। আমার রক্ত ভয় কাকে বলে তা জানে না। এই জঙ্গলের আমিই রাজা। আপনারা হয়ত বুঝতে পারবেন না আমার কথা, কি আমি বলতে চাচ্ছি। কিন্তু শুধু এই কারণেই বাঘটাকে আমারই মারতে হবে। নইলে আমার ইজ্জৎ



থাকবে না।

একটু চুপ করে থেকে টিকায়েত আবার বলল, এই টাঁড়বাঘোয়া যতদিন প্রজার মত আমার রাজত্বে ছিল, ওকে কিছুই বলিনি। গত বছরে আমার একটা ঘোড়া খেয়েছিল, তাইই ভেবেছিলাম শাস্তি দেওয়া দরকার। এবার আমার দুজন প্রজাকে ও মেরেছে!

একটু চুপ করে থেকে বলল, সমঝা না, এক জঙ্গলে দুজন রাজা থাকতে পারে না। হয় আমি থাকব; নয় টাঁড়বাঘোয়া থাকবে। আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। দয়া করে আমার কথাটা বুঝুন। এটা আমার সম্মানের ব্যাপার। আমাকে আগে চেষ্টা করতে দিন। আমি না পারলে বা আপনাদের অনুমতি দিলে তখনই আপনারা মারবেন।

টেড বলল, তা হয় না। আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। প্রথমত একনলা বন্দুক দিয়ে অতবড় বাঘকে আপনার মারতে যাওয়াটাই বোকামি। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের লোকরা আমাদের ডেকে এনেছে—তাদের এতবড় বিপদের মধ্যে ফেলে আমরা চলে ত আর যেতে পারি না।

টিকায়েত বলল, বাঘ কি কেউ শুধুই বন্দুক দিয়ে মারে? আমার বন্দুকের গুলির সঙ্গে আমার টিকায়েতের রক্ত, আমার রাগ, আমার ঘেন্না, সব কিছুই ত গিয়ে লাগবে টাঁড়বাঘোয়ার গায়ে। সে যত বড় বাঘই হোক না, আমার চোখে চোখ রাখতে পারবে? পারে কোনো প্রজা রাজার চোখে চোখ রাখতে? আমার কাছে এলেই ও ভয়েই মারা যাবে। সামনাসামনি এলে হয় একবার।

আমরা টিকায়েতের কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। অদ্ভুত মানুষ। এরকম মানুষ আমরা কেউই দেখিনি আগে। পড়িওনি কোনো বইয়ে।

টেড বলল, তাইই যদি হবে, তাহলে গত বছর আপনার গুলি খেয়ে ও বেঁচে গেল কি করে? এমন গুলিখোর বাঘকে প্রজা বানালেনই বা কেন?

টিকায়েত মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, ও আমাকে দেখতে পায়নি। আমিও ওকে দেখতে পাইনি। সেদিন আমার ছোটছেলের জন্মদিন ছিল। বাড়ির লোককে কোটরা হরিণের মাংস খাওয়াব কথা দিয়ে জলের কাছে গিয়ে বসেছিলাম। বেলা পড়ে এসেছিল। প্রচণ্ড গরমে, ক্লান্তিতে, ঘুম ঘুম এসে গেছিল। হঠাৎ দেখি, জলের পাশের পুটুস ঝোপের আড়ালে কোট্‌রা হরিণের মত লালচে কী একটা জানোয়ার এসে দাঁড়িয়েছে। কখন যে এল জানোয়ারটা তা বুঝতেই পারিনি। হরিণই হবে ভেবে গুলি করে দিয়েছিলাম বন্দুক তুলেই। গুলি করতেই বিকট চিৎকার করে এক বিরাট লাফ দিয়ে যখন সে চলে গেল, তখন দেখি টাঁড়বাঘোয়া।

কোথায় গুলি লেগেছিল?

জানি না। বোধহয় পায়ের থাবা-টাবাতে।

কি গুলি দিয়ে মেরেছিলেন?

তখন আমার বিলিতি বন্দুক ছিলো না। মুঙ্গেরি গাদা বন্দুকে তিন-আঙুল বারুদ কষে গেদে সামনে সীসার গুলি পুরে ঠুকে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, আপনি একটু আগেই বললেন যে, টাঁড়বাঘোয়াকে আপনার ঘোড়া খাওয়ার জন্য শাস্তি দিতে গেছিলেন।

আমার ঘোড়া এবং বস্তীর ধোপার গাধা। ওরা সকলেই আমার প্রজা। তাই আমারই হল। শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঘ ভেবে ত আর গুলি করিনি। কোটরা ভেবেই করেছিলাম। অত কাছ থেকে গুলি লাগলে কোটরা চিৎপাত হয়ে পড়ে যেতোই। বাঘ জানলে, ভালো করে নিশানা নিয়ে মোক্ষম জায়গাতেই মারতাম। তাহলে ওখানেই তাকে শুয়ে থাকতে হতো। তখন আমার রাশিচক্রের একটু গোলমাল চলছিল। এখন তা কেটে গেছে।

বলেই বলল, এই দেখুন, একটা মাদুলী ধারণ করেছি, বলেই, পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে সোনার হারে বাঁধা পেল্লায় একটা মাদুলী দেখাল।

টেড বলল, আমাদের শুভ কামনা রইল। কিন্তু আপনি তাহলে তিনদিন সময় নিন। তিনদিনের মধ্যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ শেষ না হলে আমরা এই উলুখাগড়ারাও কিন্তু নেমে পড়ব যুদ্ধে। আপনার কথাটা আমরা বুঝেছি, বোঝবার চেষ্টা করছি বলেই, এই কথা বলছি। এবং আগে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি। আপনার বাঘ আপনিই মারুন।

টিকায়েত এতক্ষণে হাসলো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বজরঙ্গবলী আপনাদের ভালো করুন। আমি জানতাম, আমার কথা আপনারা বুঝবেন। আপনাদের বহুত্ মেহেরবানী। জয়

বজরঙ্গবলীকা জয় !

এই বলে ত ঘোড়ায় গিয়ে উঠল টিকায়েত। বিরাট সাদা ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশর ফুলে উঠেছিল। সেই ঘোড়ার উপর এই পলাশবনা গ্রামের টিকায়েতকে রোদে সত্যি সত্যিই একজন রাজার মতই দেখাচ্ছিল।

ঘোড়ার লাগাম টেনে টিকায়েত বলল, আপনারা কিন্তু আমার অতিথি। খাওয়া-দাওয়া, সব আমারই দায়িত্ব। এখানে আপনারা রান্না করে খেলে আমি খুবই দুঃখ পাব। রান্না যদি একান্ত করেনই, তবু রসদ কিন্তু সব আমিই পাঠিয়ে দেব। এইটুকু নিশ্চয় করতে দেবেন আমাকে।

জবাবে আমাদের কিছু বলার সুযোগ না-দিয়েই টিকায়েত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলো সেই টিলার দিকে, যেখানে বুড়ি পড়ে রয়েছে।

আমি বললাম, রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই বটে। ঘোড়ায় চড়ে, শোভাযাত্রা করে কেউ মানুষখেকো বাঘ মারতে যায় শুনেছিস কখনও টেড ?

রোদের মধ্যে লাল ধুলো উড়িয়ে দুল্‌কি-চালে-চলা সাদা ঘোড়ার পিঠে বসা টিকায়েত জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেড সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ বলল, খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু মানুষটা।

আমি বললাম, ভীষণ দাম্ভিক। এত গর্ব ভালো নয়।

টেড বলল, আমি তোর সঙ্গে একমত নই। গর্ব না থাকলে কী নিয়ে মানুষ বাঁচে। গর্বর মধ্যে দোষ নেই।

কিন্তু টিকায়েতের গর্বর কারণটার মধ্যে কোনো গুণও নেই। এই গর্ব ভালো কারণে, ভালো কাজের জন্যে হলে আরও ভালো হতো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, জানিস, আমার মনে হয়, গর্ব ব্যাপারটার নিজেরও আলাদা একটা গুণ আছে। একটা বেগও আছে। যার গর্ব আছে, তার দায়িত্ব অনেক, সেই গর্বকে বাঁচিয়ে রাখার। আর এই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে করতেই এ সব মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। তাই না? দেখিস, মানুষটার এমন জেদ, ঠিক বাঘটা মেরেই দেবে। আমাদের কপালে আর মানুষখেকো মারা হলো না। মিছিমিছিই এলাম এতদূর তল্পি-তল্পা নিয়ে।

টিরিদাদা চায়ের কাপ তুলে নিতে এসেছিল, হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, বাঘে খাবে ওকে। বাঘে খাবে।

টেড ধমক দিল, কেন বাজে কথা বলছো টিরিদাদা?

টিরিদাদা বলল, বাজে কথা নয়। ও যখন কথা বলছিল, আমি তখন যমদূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি ওর একেবারে পিছনে। ওর আয়ু শেষ।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, যত্ত সব বাজে কুসংস্কার তোমার টিরিদাদা।

টিরিদাদা অভিমানের গলায় বলল, আরে! আমি দেখলাম যে নিজের চোখে।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, টিকায়েত হচ্ছে দিগা-টিকায়েতের বেটা আর আমি হচ্ছি মিরি-পাহানের বেটা। আমিও সব দেখতে পাই। সত্যিই দেখেছি যমদূতকে!

বিশ্বাস করো।

টিরিদাদার কথা যেন শোনেইনি এমনভাবে অন্যমনস্ক গলায় টেড দূরে তাকিয়ে হঠাৎই বলল, তোদের দেশে এইরকম গর্বিত, উদ্ধত সব মানুষ থাকতেও ব্রিটিশরা তোদের পরাধীন করে রাখল যে কী করে এতবছর তা ভাবলেও অবাক লাগে।

॥ ৩ ॥

টিকায়েত একটা শিশু গাছে মাচা বেঁধে বুড়ির মৃতদেহের কাছে বসেছিলো গিয়ে। তবে, গাছটা থেকে মড়িটা বেশ দূরে।

যে-লোকরা টিকায়েতকে মাচায় চড়িয়ে ফিরে এসেছিল বিকেল বিকেল তাদের মুখেই শুনলাম যে, টিকায়েত মড়ির উপরে বাঘকে মারবার আশা রাখে না। মড়িতে যাওয়া অথবা ফেরার পথেই বাঘকে মারবে এমন আশা করছে সে। একনলা গ্রীনার বন্দুকের নলের সঙ্গে তিন ব্যাটারীর টর্চ লাগিয়ে নিয়েছে ক্ল্যাম্পে। গ্রীনার নাম-করা বন্দুক। ডাবলিউ, ডাবলিউ, গ্রীনার। ইংরেজদের কোম্পানী। টিকায়েতের বন্দুকের বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল। রেঞ্জও ভাল। বাঘ যদি কাছাকাছি আসে তবে লেথাল্ বল্এর গুলি বাঘের ভাইটাল জায়গায় লাগলে বাঘ যে মরবে না, এমন কথা বলা যায় না।

আস্তে আস্তে পলাশবনার পশ্চিম দিগন্তে লালটুলিয়া পাহাড়ের আড়ালে সূর্য বিদায় নিলো। আমি সারাদিন ঘুমিয়েছি। রাতে আমিই পাহারা দেবো। টেড ঘুমোবে ঘরের বাইরে চৌপাইতে। তেঁতুলতলাতে ছায়া জমবে ঘন হয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাতে। একটু চাঁদও উঠবে শেষ রাতে। তাই সেখানে ঘুমোলে ঘুম চিরঘুমও হতে পারে। ঘরের মধ্যে

টিরিদাদা ঘুমোবে।

কিন্তু টিরিদাদা কী ঘুমোতে পারবে? টিকায়েতের পাঠানো যবের ছাতু ঘি, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে সে লিট্টি বানিয়েছিলো, তা খেয়ে এই গরমে আমাদের ত প্রাণ আঁই-ঢাঁই। আমার তাও দেশী পেট—মামাবাড়ি গিরিডিতে লিট্টি-ফিট্টি খাওয়া অভ্যেস আছে। কিন্তু বেচারী টেডএর অস্ট্রিয়ান পেটে এই লিট্টি যে কোন্ আলোড়ন তুলছে তা টেডই হাড়ে হাড়ে বুঝছে। দেখি সে পেটে ভিজে গামছা জড়িয়ে চৌপাইতে বসে হাঁসফাঁস করছে আর টিরিদাদাকে দোষারোপ করছে।

রাত আটটা বাজতে না বাজতেই গ্রামের সমস্ত শব্দ মরে গেলো। ভাঁটা পড়লে, সুন্দরবনের টাঁকে যে এক গম্ভীর, বিষণ্ণ অথচ যে-কোনো সাংঘাতিক ঘটনার জন্যে তৈরী এক নিভৃত নীরবতা নেমে আসে তার সঙ্গে এই মানুষখেকো বাঘের রাজত্বের রাতের স্তব্ধ নীরবতার তুলনা চলে। গ্রামের কুকুর-গুলোও যেন কেমন ভয়ার্ত গলায় ডাকছে। একটা বড় হুতোম পেঁচা উড়ে গেল হুরগুম্ হুরগুম্ হুরগুম্ করে ডাকতে ডাকতে তেঁতুলতলার অন্ধকার ছেড়ে। দূরে, দুটি ছোট পেঁচার ঝগড়া বাধল যেন কী নিয়ে। কিঁচি কিঁচি কিঁচর্ কিঁচি কিঁচি কিঁচর্ আওয়াজ করতে করতে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল ওরা। কিন্তু মনে হলো, ওদের মামলা সেই রাতে নিষ্পত্তি হবার নয়।

টিরিদাদা ঘর থেকে হাই তুলে বলল, হায় রাম! হায় রাম!

তারপরই সুর করে গুন্‌গুনিয়ে তুলসীদাস আবৃত্তি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর টিরিদাদা এবং টেড দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের বাইরে দেওয়ালের কাছে আমার চৌপাইটা টেনে এনে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকলাম আমি, আমার দু উরুর উপরে আমার প্রিয় রাইফেলটা আড়াআড়ি করে রেখে। এই রাইফেলটা টেডএর দেশে তৈরী। ম্যানলিকার শুনার। ক্যালিবার পয়েন্ট থ্রি-সিক্স। এই দিয়ে আমি ছায়াকেও মারতে পারি, অন্ধকারে দৌড়ে যাওয়া জংলি ইঁদুরকেও, এমনই বোঝা-পড়া হয়ে গেছিল আমার রাইফেলটার সঙ্গে বারো বছর বয়স থেকে। এই রাইফেলটা যদি কথা বলতে পারত তাহলে তোমাদের অনেক অনেক গল্প বলতে পারত। গল্প নয়: সত্যি কথা সব।

দূরের মহুয়া গাছগুলোর নিচে শম্বরের দল মহুয়া কুড়িয়ে খাচ্ছে। হাওয়াতে মহুয়ার গন্ধ আর করৌঞ্জের গন্ধ ভাসছে। হঠাৎ মহুয়াতলাতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বোধহয় ভাল্লুকদের সঙ্গে মহুয়ার ভাগ নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে শম্বরদের।

তোমরা কী কখনও ভাল্লুকদের গাছে চড়তে দেখেছো? দেখলে হেসে কূল পাবে না। ওরা পেছন দিক দিয়ে গাছে ওঠে। কেন যে অমন করে ওঠে তা জিগগেস করার ইচ্ছে আছে অনেকদিনের কিন্তু একটাও বাংলা বা ইংরিজী জানা ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা-না-হওয়ায় জিগগেস করা হয়ে ওঠেনি। ওদের নিজেদের ভাষায় শব্দ বড় কম এবং আমাদের অভিধানে

তাদের মানেও লেখা নেই।

টিকায়েত কী করছে এখন কে জানে। এমন অন্ধকার চারদিকে যে, মনে হয় অন্ধকার মুখে-চোখে থাপ্পড় মারছে। দু'হাত দিয়ে অন্ধকারের চাদর সরিয়ে দেখতে চাইলেও কিছুই দেখা যায় না।

গরমের দিনে জঙ্গলে হাওয়া বয় একটা। শুকনো লাল হলুদ পাতা ঝরিয়ে পাথরে আর রুখু মাটিতে গড়িয়ে সেই হাওয়া ঝর্ ঝর্ সড়্ সড়্ শব্দ তুলে বেগে বয়ে যায় দমকে দমকে। তখন টিরিদাদার ভাষায়: যত সব কাটনেওয়ালা জানোয়ারদের চলাফেরার ভারী সুবিধা। শব্দের মধ্যে, মর্মরধ্বনির মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না কিনা অন্য অহিংস্র জানোয়ারেরা!

নিস্তব্ধ বন জঙ্গলে যখন হাওয়া থাকে না, নিথর হয়ে থাকে যখন আবহাওয়া, তখন একটা ঝরা-পাতা মাটিতে পড়ার আওয়াজকেও বোমা পড়ার আওয়াজ বলে মনে হয়। জংলী ইঁদুর বা গিরগিটি মরা ঘাস পাতার উপর দিয়ে দৌড়ে গেলে মনে হয় কোনো বড় জানোয়ারই বা দৌড়ে গেল বুঝি। যখন চোখ কোনো কাজে লাগে না তখন কান দিয়েই দেখতে হয়।

এই অন্ধকার, তারা-ফোটা হালকা নীল সিল্ক শাড়ির মত উদ্বেল আকাশ যেন উড়তে থাকে মাথার উপরে আদিগন্ত চাঁদোয়ার মত। হাওয়াতে তারারা কাঁপে, মনে হয় মিট্‌মিট্ করে। দারুণ লাগে তখন তাকিয়ে থাকতে। অন্ধকারের এক দারুণ পুরুষালী মৌনী রূপ আছে। তোমরা যদি মনের সব

জানালাগুলো খুলে দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের আন্তরিকতা দিয়ে সেই রূপকে অনুভব করার চেষ্টা করো, তাহলে নিশ্চয় তা অনুভব করতে পারবে। এমন সব অন্ধকার রাতেই ত আলোর তাৎপর্য, আলোর আসল চেহারাটা বোঝা যায়। অন্ধকার নইলে, আলো আলোকিত করত কাকে ?

দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে এসব ভাবছি। টেড রীতিমত নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ওর নাক ডাকলে অদ্ভুত একটা ফিচিক্ ফিচিক্ করে আওয়াজ হয়। সাহেবদের ব্যাপারই আলাদা। আর ঘরের মধ্যে টিরিদাদা! ঐ রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা হলে কী হয়, ওর নাক-ডাকা শুনলে মনে হয় ধাঙ্গড়পাড়ার কোনো কোঁৎকা শুয়োরকে বুঝি কেউ জলে ডুবিয়ে মারছে।

টাঁড়বাঘোয়া যদি কাছাকাছি এসে পড়ে তবে নির্ঘাৎ টিরিদাদার জন্যেই আসবে এবং তাহলে টিরিদাদার কারণেই বাঘকে গুলি করার সুযোগ পাবো।

কিন্তু বাঘ যদি সত্যিই এসে পড়ে তাহলেও কী গুলি করা মানা! টিকায়েতকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কথা ছিল, আমরা বাঘ মারতে যাবো না তিনদিন। কিন্তু বাঘ যদি আমাদের মারতে আসে তাহলে কী করব সে কথা আমাদের "জেন্টলমেনস্ এগ্রিমেন্টে" লিখতে ভুল হয়ে গেছে। মহা চিন্তার কথা হলো।

জঙ্গলের মধ্যে ডিউ-উ-ডু-ইট্ পাখি ডাকছে উড়ে উড়ে। ঐ পাখিগুলো যখন আকাশে উড়ে বেড়ায় তখন ওদের লম্বা পা দুটি শূন্যে আলতো হয়ে ঝোলে লট্‌পট্ করে, ভারী মজার লাগে দেখতে। এদের চোখ এড়িয়ে রাতের জঙ্গলে কোনো কাটনেওয়ালা জানোয়ার অথবা মানুষের চলাফেরা করা ভারী

মুশকিল। কি দেখল পাখিগুলো কে জানে?

এখন ঐ টিলার কাছে অন্ধকার কেমন ঘন হয়েছে তাই ভাবছিলাম। টিকায়েত মাচাতে একাই বসেছে। তবে, তুপাশের তুটি গাছে তীর-ধনুক নিয়ে তার তুই অনুচর বসেছে। টিকায়েতের মাচাটাই নাকি সবচেয়ে নিচু। নিচু না হলে গুলি করতে অসুবিধা হয়। তবে বেশী নিচু হলে বিপদও থাকে। বিশেষ করে, মানুষখেকো বাঘের বেলাতে। সেই রঙ্গমঞ্চে এখন কী প্রতীক্ষা আর তিতিক্ষার সঙ্গে বসে আছে পলাশবনা গ্রামের রাজা আমাদের টিকায়েত, কে জানে!

বসে বসে এই সব ভাবছি। আর ঘুমিয়ে যাতে না পড়ি সে কথা নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক এমন সময় আমাদের সোজা সামনে প্রায় মাইল খানেক ভিতরে গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে বাঘের ডাক শোনা গেল। উম্—আঁও—।

গভীর রাতের সমস্ত শব্দমঞ্জরী, পিউ-কাঁহা পাখির ক্রমাগত ডাক, পেঁচাদের চেঁচানি সব মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। এই জন্যেই বাঘকে বলে, বনের রাজা। সে কথা বললে বনের সব প্রাণী চুপ করে থাকে সম্ভ্রমে; সম্মানে।

বাঘ যেদিক থেকে ডাকল সেই দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক সেদিক থেকে অন্য একটা বাঘের ডাক ভেসে এল। এই ডাকটা অনেক বেশী গম্ভীর, ভারী এবং জোর। মনে মনে ভাবলাম, ঐ দ্বিতীয় বাঘটাই টাঁড়বাঘোয়া।

হঠাৎ দেখি টেড উঠে বসেছে চৌপাইয়ে।

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ কচলে বলল, বাঘেরা কি মিছিল করে বেরুল নাকি?

আমি বললাম, শ্—শ্—শ্— ।

এমন সময় প্রথম বাঘটা আবার ডাকল এবং ডেকে দ্বিতীয় বাঘটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। একদল হনুমান হুপ্—হুপ্—হুপ্ ডাক ছেড়ে পাতা-ঝরা গাছেদের ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল।

টেড বলল, দুজনে মিলে বুড়ি আর টিকায়েত যেদিকে আছে সেদিকে যাচ্ছে। বুঝলি।

আমি বললাম, তাই-ই ত মনে হচ্ছে।

টেড বলল, টিকায়েত দুটো বাঘকে সামলাবে কী করে একা? তারপর মাচাও ত শুনলাম বেশী উঁচু করেনি।

আমি বললাম, সে সেই-ই বুঝবে। তুই চুপ করে শুয়ে পড়্ না।

কেন? চল্ না আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি। বাঘেদের আওয়াজ যখন শোনা গেল তখন চল্ স্টক করি।

আমি বললাম, এই অন্ধকারে? মানুষখেকো বাঘের পিছনে পায়ে হেঁটে! দিনে হলে তাও কথা ছিল।

তারপরই বললাম, আমার একটাই জীবন। জীবনটাকে আমি খুবই ভালবাসি। আত্মহত্যার মধ্যে আমি নেই।

টেড বলল, তুই ভীতু।

তবে তাই।

টেড আবার শুয়ে পড়ল।

ডানদিক থেকে একটা কোট্‌রা হরিণ ক্রমাগত ডাকতে লাগল ভয় পেয়ে। তার ব্বাক্—ব্বাক্—ব্বাক্ ডাক জঙ্গলে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল আমার মাথার

মধ্যে। ডিউ-উ-ডু-ইট পাখিগুলো ডিউ-উ-ডু-ইট, ডিউ-উ-ডু-ইট করে ডাকতে ডাকতে ডানদিকে উড়ে উড়ে সরে যেতে লাগল।

চোখ কান সজাগ রেখে আমি বসে রইলাম। একটু পরই আবার টেড়ের ফিচিক্ ফিচিক্ করে নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। টিরিদাদার নাক ডাকা এখন বন্ধ। কি হল কে জানে।

ডিউ-উ-ডু-ইট পাখিগুলোর ডাক ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ওরা অনেক ডানদিকে চলে গেছিল ততক্ষণে। কে জানে, বাঘ দুটো এখন কোথায়? টিকায়েতই বা কি করছে? অত নিচুতে মাচাটা বাঁধা ঠিক হয়নি। দু দুটো বড় বাঘ। তায় মানুষখেকো।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম, রাত তিনটে বেজে গেছে। আমার বসে থেকে থেকে খুবই ঘুম পেয়ে গেছিল। শেষ রাতের ফুরফুরে হাওয়া, মহুয়া আর করৌঞ্জের মিষ্টি গন্ধ; ঘুমের দোষ নেই। পাছে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই উঠে পায়চারী করতে লাগলাম রাইফেল হাতে। একবার পিছন ফিরতেই মনে হল একটা ছায়া যেন সরে গেল তেঁতুলতলার পাশ থেকে। টর্চ ফেলে দেখলাম, শেয়াল। একজোড়া। আলো পড়তেই ওদের দু-জোড়া চোখ জ্বলে উঠল লাল হয়ে। পরক্ষণেই ওরা চলে গেল।

আস্তে আস্তে পুবের আকাশের অন্ধকারের ভার হাল্কা হতে লাগল। অন্ধকারেরও যে কতরকম রঙ, কতরকম ঘনতা, তা ভাল করে নজর করে দেখলে দেখা যায়। অন্ধকারের

গায়ের কালো, ফিকে হতে হতে জোলো দুধের মত সাদাটে হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, তারপর মিহি সিঁদুরের হালকা গুঁড়োর মত রঙ লাগবে আকাশের পুবের সিঁথিতে। আরও পরে, আসামের পাকা কমলালেবুর রঙের মত লাল হবে। তারপর রোদ উঠলে আলোর রঙকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। সূর্যের সাত রঙ মাখামাখি হয়ে উজ্জ্বল দিনের শরীরে বিশ্বচরাচরকে আলোকিত করে তুলবে। রাতের পাখিরা, রাতের প্রাণীরা ঘুমুবে; দিনের পাখি, প্রজাপতি, নানান প্রাণী জেগে উঠবে। ভোরের মিষ্টি ঠাণ্ডায় আর দিনের আলোর অভয়-আশ্বাসে কচি পাতা ছিঁড়ে খাবে চিতল হরিণের দল। শম্বরেরা গাঢ় জঙ্গলের ভিতরে কোনো নালার ছায়াতে গিয়ে ঢুকবে! শুয়োরেরা নেমে যাবে পাহাড়তলীর খাদে। রাতভর পেটভরে খাওয়ার পর চিৎ-পটাং হয়ে পড়ে থাকবে এ ওর ঘাড়ে ঠ্যাং তুলে দিয়ে।

ভোর হয়ে আসছে, এমন সময় পরপর দু-দুটো গুলির আওয়াজ কানে এলো। প্রথম গুলিটা থেকে পরের আওয়াজটা দু মিনিট মত ব্যবধানে হল।

তারপর সব চুপচাপ।

টেড গুলির শব্দে লাফিয়ে উঠল। টিরিও বাইরে এলো। কথা না বলে, কাঠের উনুনে চায়ের জল চাপালো। তারপর বালটিতে করে জল আর হাতে করে ঘটি নিয়ে এলো আমাদের জন্যে।

টেড বলল, দেখলি, তোকে বলেছিলাম, মিছিমিছিই এলাম আমরা। টিকায়েতই মেরে দিল দু-দুটো বাঘ। তার কথা

রাখল। এবার চল্, টিকায়েতের মাঠরী আব চা খেয়ে মহুয়া-মিলনে ফিরি আমরা। আর এখানে থেকে কী করব?

আমি বললাম, গাঁয়ের লোকেরা একটা শম্বর মেরে দিতে বলেছিলো যে, ওদের। বলেছিলো, বহুদিন ভাল করে মাংস খায় না ওরা! কথা দিয়েছিলাম, একটা শম্বর মেরে দেবো ওদের খাওয়ার জন্য। মাংস ওদের দিয়ে, আমরা চামড়াটা নিয়ে চলে যাব।

টেড বলল, বুঝলি, এবার একটা স্যুটকেশ বানাবো আমি, তুই শম্বর মারলে।

তারপর বলল, কিন্তু এই এমনভাবে বলছিস যে, মনে হচ্ছে গাঁয়ের লোকে তোর জন্যে যেন শম্বর গাছতলাতে বেঁধে রেখেছে?

আমি বললাম, বেঁধে রাখবে কেন? বাঘ মরে গেছে তো আর ওদের জঙ্গলে যেতে ভয় নেই কোনো। ওরা জঙ্গলের সব খবরই রাখে। জানোয়ারদের বাহান্ সাহান্-এরও। ওরা হাঁকোয়া করবে আর জায়গামতো আমরা রাইফেল নিয়ে দাঁড়ালেই মারা পড়বে শম্বর।

তা হতে পারে।

বলেই, টেড বলল, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসছি।

তারপর বলল, টিরিদাদা এক ঘটি জল দাও জঙ্গলে ঘুরে আসি।

আমি বললাম, খালি হাতে যাস না, রাইফেলটা নিয়ে যা।

টেড বলল, রাইফেল আর কি হবে? বাঘ তো মরেই গেছে।

টেড আর টিরিদাদা ঘুম থেকে উঠে পড়ার পর আমার হু

চোখে ঘুম যেন ভেঙ্গে এলো।

চৌপাইটা টেনে নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

টিরিদাদা চা আর মাঠরী এনে ডাকলো আমাকে।

চোখ মেলে দেখলাম, টেড ফিরে আসছে জঙ্গল থেকে।

হঠাৎ টিরিদাদা দূরে চেয়ে বলল, ও কি? কারা অমন দৌড়ে আসছে?

টেড ও আমি তাকালাম ওদিকে। ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক আমাদের কাছে চলে এসেছে। আমাদের যখন সকাল, গ্রামের লোকের তখন অনেক বেলা। দুটো লোক ডানদিক থেকে দৌড়ে আসছে আর টিকায়েতের সাদা ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে কে যেন নিয়ে চলেছে ঐ লোকগুলোর দিকেই। টিকায়েতের সহিস হবে।

ছুটে-আসা লোক দুটোর সঙ্গে যখন ঘোড়া আর সহিসের দেখা হলো তখন ওরা সকলে মিলে একসঙ্গে আমাদেরই দিকে জোরে ফিরে আসতে লাগল। সহিস, যে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঐদিকে এতক্ষণ, সে-ও ঘোড়ার পিঠে উঠে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের আগে আগেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছে গেল।

ঘোড়া থেকে নেমেই সহিস বলল, খাত্‌রা বন্‌ গীয়া সাহাব। খাত্‌রা বন্‌ গীয়া। ভারী খাত্‌রা।

গ্রামের লোকেরা উঁচু নিচু নানা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, খাত্‌রা বন্‌ গীয়া হো ও-ও-ও-ও, খাত্‌রা বন্‌ গীয়া।

আর সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পিল্‌ পিল্‌ করে ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই দৌড়ে এল এদিকে!

সহিস, আমাদের দুঃসংবাদটা দিয়েই জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল টিকায়েতের বাড়িতে খবরটা দিতে। ততক্ষণে সেই ছুটে আসা লোক দুটোও আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

ওরা এসেই ধ্বপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল। ওরা যা বলল, তার সারমর্ম হল এই—

বাঘ দুটো সারারাত টিলার অন্য পাশে ছিল। ওদের সামনে দিয়ে একবারও যায়নি। ওদের অনেক পিছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে টিলার পিছনে পৌঁছেছিল, তাই টিকায়েতের গুলি করার সুযোগ আসেনি। টাঁড়বাঘোয়া নয়, অন্য বাঘটা বোধহয় কোনো হরিণ-টরিণ মেরে থাকবে। সেটাকে ওরা দুজনে মিলে টেনে নিয়ে গেছিল টিলার পিছনে। কোনো কিছু টেনে নিয়ে যাবার আওয়াজ পেয়েছিলো ওরা। টিলার কাছাকাছি অন্ধকার এত ঘন ছিল যে, চোখে নিজেদের হাত-পা-ই ওরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছিলো না অন্ধকারে। দূরের কিছু দেখার কথাই ওঠে না। সারারাত বাঘ দুটো জানোয়ারটার মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করে হাড় কড়মড়িয়ে খেয়েছে আর মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করেছে। বুড়ির মৃতদেহ যেখানে পড়েছিলো সেখানে কিন্তু একবারও আসেনি একটা বাঘও, সারা রাতে।

যখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, তখন টাঁড়বাঘোয়া আস্তে আস্তে, হয়ত মুখ বদলাবার জন্যেই বুড়ির পা আর মাথা যেখানে পড়েছিলো সেইদিকে এগিয়ে এসে বুড়িকে খেতে শুরু করল। বিরাট বাঘটাকে তখন আবছা আলোতেও দেখা যাচ্ছিলো। আবছা-আলোতে খুব ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে

নিশানা নিয়ে টিকায়েত গুলি করে। গুলি লেগেছিলো টাঁড়বাঘোয়ার গায়ে। ঠিক কোন্ জায়গায় তা ওরা বলতে পারবে না।

গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা একটা সোজা লাফ দিয়ে উপরে উঠলো প্রায় পনেরো ফিট। তার পরে ধপ্পাস্ করে পড়ল নিচে, ডিগবাজী খেয়ে। পড়েই, আর এক লাফে টিলার আড়ালে চলে গেলো একটুও শব্দ না করে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঘিনী বেরিয়ে এলো টিলার আড়াল থেকে, বেরিয়ে এসে যেখানে টাঁড়বাঘোয়ার গায়ে গুলি লেগেছিল, ঠিক সেখানেই এসে দাঁড়াল। টিকায়েত ততক্ষণ ফোটা গুলিটা বদলে নিয়েছিল। বাঘিনী এসে দাঁড়াতেই টিকায়েত আবার গুলি করল। চমৎকার গুলি। গুলিটা পাশ ফিরে দাঁড়ানো বাঘিনীর বুকে লাগল। বুকে লাগতেই একবার যেন পড়ে যাচ্ছে বলে মনে হল বাঘিনীটা কিন্তু তারপরই টিকায়েতের মাচা দেখতে পেয়ে জোরে কিছুটা নিচু হয়ে দৌড়ে এসেই সোজা লাফ মারল মাচার দিকে। গুলি পাল্টাবার সময়টুকুও পেলো না আর টিকায়েত। দোনলা বন্দুক থাকলে মেরে দিতো নিশ্চয়ই আরেকটা গুলি। কিন্তু এক লাফে সোজা এসে পড়ল মাচাতে তারপর টিকায়েতের গলা কামড়ে মাচা ভেঙ্গে দুজনে নিচে পড়ল। নিচে পড়তেই, টিলার আড়াল থেকে টাঁড়বাঘোয়া জোরে দৌড়ে এসে টিকায়েতকে কামড়ে ধরলো তারপর দুজনে টানাটানি করে তাদের চোখের সামনেই টিকায়েতের হাত-পা সব আলাদা করে ফেলল।

টেড বলল, বেঁচে ছিলো টিকায়েত তখনও? বেঁচে আছে?

ওরা বলল, টিকায়েতের ঘাড় কামড়ে ধরতেই সে মরে গেছিল।

টেড আবার বলল, তোমরা তীর ধনুক নিয়ে কি করছিলে? মারতে পারলে না তীর? মজা দেখতে গেছিলে নাকি তোমরা?

প্রথম লোকটা বলল, যতক্ষণ বুঝিনি যে, টিকায়েত মরে গেছে ততক্ষণ মারিনি। যেই বুঝলাম যে, সে আর বেঁচে নেই তক্ষুনি আমরা দুজনেই সমানে তীর মারতে লাগলাম। যদিও তখন চোখের সামনে ঐ দৃশ্য দেখে আমাদের বেহুঁশ অবস্থা। তবুও তিন-চারটে করে তীর লেগে থাকবে এক একটা বাঘের গায়ে।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, তারপর কি হলো?

তারপর? বলেই, লোকটা চুপ করে থাকল।

দুটো লোকেরই চোখ মুখ দেখে মনে হল যে ওরা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে, বা হয়ে যাবে এক্ষুনি।

একজন বলতে গেল, তারপর···

বলেই, থেমে গিয়ে দু হাত দিয়ে উঠোনের ধুলো মুঠিতে ভরে আবার ফেলতে লাগল।

অন্যজন থম্‌থমে নিচু গলায় বলল, তারপর টিকায়েতের একটা হাত শুধু ফেলে রেখে, টিকায়েতকে দু টুকরো করে দু জনে মুখে করে নিয়ে টিলার আড়ালে চলে গেল।

এইটুকু বলেই, লোকটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে ওরা দু জনেই তখন কাঁপছিলো।

আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি বলব, কেমন করে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

টেড বলল, এখনও কি বাঘ দুটো ওখানেই আছে?

অন্য লোকটা বলল, তা কি করে বলব?

সেই সময় টিকায়েতের এগারো সন্তানের মধ্যে পাঁচজন হাজির হল এসে আমাদের সামনে। পাঁচটিই ছেলে, বড় ছেলেটির বয়স হবে চোদ্দ-পনেরো। সে কেঁদে হাতজোড় করে টেডকে বলল, সাহাব, মেরা বাবুজী কী খুন্‌কা বদ্‌লা লিজিয়ে আপলোগোঁনে। ইয়ে গাঁওকে যিত্‌না আদমি হ্যায়, যিত্‌না ধন-দৌলত হ্যায় সব আপলোগোঁকো দে দুংগা। বদ্‌লা লিজিয়ে সাহাব।

বলেই, ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

টিরিদাদা তখনও চা আর রেকাবীতে মাঠরী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো স্ট্যাচুর মত আমাদের পাশে।

টেড তাড়াতাড়ি গামছা ছেড়ে শর্টস আর খাকী বুশ কোট পরে নিল। নিয়ে ওর ফোর-ফিফ্‌টি-ফোর হাণ্ডে্ড ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বুক পকেটের খোপে খোপে ছটি গুলি ভরে নিল। দু ব্যারেলে দুটি ভরল। আমি ত তৈরীই ছিলাম। সারা রাত জেগে ছিলাম, এককাপ চা খেয়ে গেলে ভালই হতো। কিন্তু তখন চা খাওয়ার মত মনের অবস্থা ছিল না।

কিন্তু টিরিদাদা ও গাঁয়ের লোকেরাও আমাদের জোর করল। বলল, কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। ফিরতে ফিরতে

রাতও ত হতে পারে।

ফিরতে যে না-ও পারি, সে কথা আর মুখে কেউই বলল না।

বলল, চা-এর সঙ্গে ভাল করে নাস্তাও করে যান।

নাস্তা-ফাস্তা করার মত অবস্থা তখন একেবারেই ছিলো না আমাদের। শুধু মাঠরী দিয়ে চা খেলাম। টিকায়েতেরই পাঠানো মাঠরী। এতক্ষণে আমরা যেভাবে মাঠরী খাচ্ছি সেইভাবে টাঁড়বাঘোয়া আর তার সঙ্গিনী টিকায়েতের শরীরটাকে খাচ্ছে হয়ত। ঈস্‌স্! ভাবা যায় না, জলজ্যান্ত লোকটা!

ছজনের কাঁধে ছুটো জলের বোতল দিয়ে দিল টিরিদাদা। আমরা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এগোলাম।

কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের লোক দৌড়ে এসে আমাদের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সকলে বলল, ওর বৌকেই নিয়ে গেছিল টাঁড়বাঘোয়া প্রথম দিন।

লোকটার হাতে একটা মস্ত চকচকে টাঙ্গী। কাঁধে তীর ধনুক। ও বলল, আমাকে সঙ্গে নিন আপনারা। আমি টাঁড়বাঘোয়ার মাথায় নিজে হাতে টাঙ্গী মারব। টাঙ্গী মেরে আমার বাসমতীর মৃত্যুর বদলা নেবো।

আমরা চলতে চলতেই ওকে অনেক বুঝিয়ে, তারপর ফেরৎ পাঠালাম।

টিরিদাদা গ্রামের শেষ পর্যন্ত এলো। আমরা ছজনেই ওর মুখের দিকে চাইলাম।

বললাম, চলি টিরিদাদা।

টিরিদাদার মুখটাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো।

কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। বোধহয় ও আমাদের যেতে মানা করবে ভেবেছিল। তারপর গ্রামের এতগুলো লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, টিকায়েতের ছেলের কান্না-ভেজা মুখের দিকে চেয়ে বলল, এসো, এসো। যাওয়া নেই, এসো।

তারপর জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমাদের জন্যে ফাস্টক্লাস ভাত আর মুরগীর ঝোল রেঁধে রাখব। এসেই, চান করে খেতে বসে যাবে। যাও, দেরী কোরো না ফিরতে। আমি কিন্তু না খেয়ে বসে থাকব তোমাদের জন্যে।

গ্রামের লোকের কাছে শুনলাম যে, টিকায়েতের মা এখনও বেঁচে আছেন। উনি এবং টিকায়েতের স্ত্রীও হয়ত কাল বিকেলে এমনি করেই টিকায়েতকে বিদায় দিয়েছিলেন।

আমি খুবই উত্তেজনা বোধ করছিলাম। মানুষখেকো বাঘের অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নি। তারপর আবার একসঙ্গে দু-দুটো আহত বাঘ-বাঘিনী। টাঁড়বাঘোয়ার পায়ের দাগ দেখে এবং বর্ণনা শুনেই ত তার চেহারা সম্বন্ধে অনুমান করে নিয়েছিলাম। বাঘিনী টাঁড়বাঘোয়ার চেয়ে ছোট, কিন্তু সেই-ই ত মাচায় উঠে ধরেছে টিকায়েতকে। এখন দুজনেই গুলি খেয়ে যে কী সাংঘাতিক হয়ে আছে কে জানে?

টেড নিচু স্বরে বলল, টিকায়েত কিন্তু খুবই ভাল শিকারী। ভোরের আবছা-আলোতে দু দুটো বাঘকেই উনি গুলি করেছিলেন ভাইটাল জায়গাতে। কিন্তু, এই জন্যেই আমি

সব সময় বলি তাকে যে, হেভী রাইফেল ছাড়া বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে আসা বড় বিপদের। তোর রাইফেলটাও এবার কোলকাতায় ফিরে বদলে নে তুই। পায়ে হেঁটে বাঘের মোকাবিলা করতে সব সময়েই হেভী রাইফেল নিয়ে যাওয়া উচিত। ঐ গুলি দুটি যদি রাইফেলের হতো তবে বাঘ বাবাজীরা ঐখানেই শুয়ে থাকত। তবে টিকায়েত বাঘিনী মাচায় উঠতেই দ্বিতীয় গুলি হয়ত করে ফেলতে পারতো। এই সব কারণেই ওঁকে মানা করেছিলাম একনলা বন্দুক না-নিয়ে যেতে। শুনলে না। কী আর করব আমরা?

তারপর বলল, তাছাড়া, আমার দৃঢ় বিশ্বাস গুলিগুলো খুবই পুরোনো ছিল। কে জানে কোথা থেকে কিনেছিল। গুলি ভাল থাকলে সত্যি সত্যিই দু দুটো বাঘই বেচারী মারতে পারত। নিজেও মরত না।

আমি বললাম, দুজনে একসঙ্গে থাকলে কিন্তু হবে না টেড। টিলাটার কাছে গিয়ে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে। তুই কার পিছনে যাবি? টাঁড়বাঘোয়া? না বাঘিনী?

টেড বলল, আমরা মারতে পারলেও, দুটো বাঘের একটাও তো আমাদের কারোই হবে না, কারণ প্রথম রক্ত তো টিকায়েতের গুলিতেই বেরিয়েছে।

আমি বললাম, তা ঠিক।

তোমরা হয়তো জানো না যে, শিকারের অলিখিত আইনে বলে, যার গুলিতে প্রথম রক্তপাত ঘটাবে, শিকার তারই। যদি কোনো শিকারীর গুলি বাঘের লেজে লেগেও রক্ত বেরোয়

এবং বাঘ সাক্ষাৎ যম হয়ে থাকে, তবুও যে শিকারী নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেই বাঘকে অনুসরণ করে গিয়ে মারবেন বাঘ সেই শিকারীর হবে না। যিনি লেজে গুলি করে রক্ত বের করেছিলেন, তাঁরই হবে। সকলেই মেনে নেবেন যে, বাঘ প্রথম জনই মেরেছেন।

চারদিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, এ তো আর বাহাদুরী বা হাততালির ব্যাপার নয়। বাঘ কার হলো, তারও ব্যাপার নয়। পাহাড় জঙ্গলের গভীরে একটি ছোট্ট গ্রামের সব কটি মানুষ তাদের বাঁচা-মরা, তাদের আশা-ভরসা, তাদের সব বিশ্বাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে আন্তরিক-ভাবে, চোখের জলে। আমাদের বয়স এবং অভিজ্ঞতা কম হলেও, আমরা যাতে তাদের বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারি, তাদের চিরদিনের কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পারি তারই চেষ্টা করতে হবে।

আমরা কি পারব এই কঠিন কাজের যোগ্য হতে?

আমরা দুজনেই নিজের নিজের মনে সে কথা ভাবছিলাম। মুখে কথা ছিলো না কারোই। যদি বিপদমুক্ত করতে পারি ওদের তবেই না আমাদের মান থাকবে আর যদি না পারি?

নাঃ, সে সব ভাবনা এখন থাক।

টেড বলল, এখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কাল সকালে টিকায়েতকে অমন করে না বললেও পারতাম। আমি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি আমার রসিকতা সত্যি হবে?

কি বলেছিলি তুই?

বলিনি? যে, কালই আপনাকে দাহ করতে হবে আমাদের?

কুয়োতলাটা পেরিয়ে গিয়েই হঠাৎ টেড ঘুরে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে বলল, এক সেকেণ্ড দাঁড়া। টস্ করছি। যে জিতবে, সেই টাঁড়বাঘোয়ার দায়িত্ব পাবে যে হারবে সে বাঘিনীর। ওকে?

আমি বললাম, ওকে।

আসলে আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা ছিলো যে টাঁড়বাঘোয়ার পিছনেই যাই। সে-ই যে নাটের গুরু।

টেড বলল, তোর কি।

আমি বললাম, টেল্!

টেড অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিল আধুলিটা। মাটিতে পড়েই কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে লাল ধুলোর মধ্যে একটা শালের চারার গোড়াতে আটকে গেল সেটা। আটকে যেতেই উল্টে গেল!

আমরা দুজনেই সেখানে পৌঁছে দেখলাম, টেল রয়েছে উপরে। হেড নীচে।

টেড আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল।

আমরা দুজনেই জানতাম যে বে-জায়গায় গুলি-লাগা বাঘ সাক্ষাৎ যম হয়ে ওঠে। তার কারণ, যতক্ষণ বাঘের চারটি পা এবং মুখ এবং মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ বাঘ পুরোপুরি সমর্থ। তার উপর পেটে গুলি লাগলে প্রচণ্ড যন্ত্রণার কারণে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। সেই দিক দিয়ে দেখলে টাঁড়বাঘোয়া এখন বাঘিনীর চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ—তার চেহারার বিরাটত্ব বাদ দিয়েও! বাঘিনীর

গুলি লেগেছে বুকে—অবশ্য লোক দুটো ভুলও বুঝতে পারে—ভুল বোঝা একটুও অস্বাভাবিক নয়—। কিন্তু যদি ঠিক বুঝে থাকে, তাহলে বাঘিনীর লাংস কিংবা হার্টে গুলি লাগা অসম্ভব নয়। হার্টে লাগলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়ার কথা। লাংসে লাগলে কিছুক্ষণ বাঁচে। লাংসে গুলি লাগলে বাঘের গায়ের থেকে যে রক্ত বেরোয়, তাতে ফেনা দেখা যায় অনেক সময়। ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, দুটি বাঘই খুব সম্ভব মানুষখেকো এবং সগু আহত।

অতএব···

সাবধানে, চারদিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে গেছি আমরা!

এবার টিলাটার কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে টিলাটা। সকালের রোদে মাথা উঁচু করে আছে। আর একটু এগোতেই মাচাটার ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। চৌপাইয়ের চারটে পায়া ঠিক আছে। দড়ি ছিঁড়ে এবং পাশের এক দিকের কাঠ ভেঙ্গে মাচাটা গাছটা থেকে তখনও নিচে ঝুলছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভোরের ফিস্‌ফিসে হাওয়া আর ছাতারেদের ডাক ছাড়া।

আর একটু এগিয়ে যেতেই আমি আর টেড দুজনেই চমকে উঠলাম।

একটু দূরেই বুড়ির একটি পা পড়ে আছে। নীলরঙা বড় বড় মাছি ভন্ ভন্ করছে তাতে। এত দুর্গন্ধ যে, কাছে যাওয়া যায় না।

আর মাচার থেকে একটু দূরে, সোজা, কি যেন একটা জিনিস পড়ে আছে। টেডকে ইঙ্গিতে চারপাশে নজর রাখতে বলে আমি এগিয়ে গিয়ে দেখতে গেলাম জিনিসটা কি ?

কিন্তু না গেলেই বোধহয় ভাল হতো। সিল্কের পাঞ্জাবী-সুদ্ধ টিকায়েতের বাঁ হাতটি কনুই থেকে পরিষ্কার করে কাটা। পুরুষ্টু বাঁ হাতে হাতঘড়িটা বাঁধা আছে তখনও। সোনার সাইমা ঘড়ি একটা, কড়ে আঙুলে পলার আংটি। আঙুল-গুলো দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। হাতটা এমন করে দাঁত দিয়ে কেটেছে যে দেখলে মনে হয় কোনো মেশিনে কাটা হয়েছে বুঝি।

টেড একটু এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তারপর আমাকে ইশারা করে নিজেও এগিয়ে গেল। টাঁড়বাঘোয়া এবং বাঘিনীর পায়ের দাগ দেখে দেখে আমরা খুব সাবধানে টিলার উল্টোদিকে এলাম. রাইফেলের সেফটি-ক্যাচে আঙুল রেখে।

ঐখানে পৌঁছেই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। আলাদা হওয়ার আগে ঘড়িতে দেখলাম সকাল সাতটা বেজেছে। টেড ফিস্‌ফিস্ করে বলল, সন্ধ্যে হবে সাতটাতে। আমাদের হাতে বারো ঘণ্টা করে সময়। আমরা একা একাই খুঁজব বাঘদের। যদি দেখা না হয়, সাতটার সময় কুয়োতলায় পৌঁছাব আমরা। কুয়োতলাই রাঁদেভু-পয়েন্ট আমাদের।

তারপর বলল, গুড লাক্। গুড হান্টিং।

আমি হাত তুলে ওকে শুভেচ্ছা জানালাম।

তারপর আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম।



টেড গেল পুবে। আমি পশ্চিমে।

একটু এগোতেই একটা গেম-ট্র্যাকের দেখা পেলাম। জঙ্গলে জানোয়ার-চলা সুঁড়ি পথ। নানান জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে সেখানে। পথটা বেরিয়েছে একটা ফাঁকা টাঁড়মত জায়গা থেকে। পথটার গোড়াতেই কতগুলো কুঁচফলের ঝোপের গায়ে দেখলাম রক্ত লেগে আছে। তখনও শুকিয়ে যায়নি রক্ত। ঝোপের এমন জায়গাতে লেগে আছে রক্ত যে মনে হয় বাঘের বুক বা পেট সেই ঝোপে ঘষা খেয়েছে। বুক হলে বাঘিনীর বুক, পেট হলে টাঁড়বাঘোয়ার পেট। কারণ রক্ত বেশ উঁচুতেই লেগে আছে।

প্রথমটা কিছুক্ষণ রাইফেল সামনে করে আমি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগোলাম। যাতে নিচে ভালো করে নজর করতে পারি। নাঃ, কোথাও কিছু নেই। তবে পথে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে রয়েছে।

পথটা এঁকেবেঁকে গেছে। কাছেই, সামনে একটা ঝর্না আছে। তার ঝরঝর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খুবই সাবধানে এগোচ্ছি। ঐ অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘামে গা এবং হাতের পাতা ভিজে গেছে আমার। হয়ত ভয়েও।

মিনিট পনেরো ঐভাবে চলার পর ঝর্নাটার কাছে এসে গেলাম। তখন আরো সাবধান হলাম।

এক হাত যাচ্ছি আমি পাঁচ মিনিটে, প্রায় শুয়ে শুয়েই, যেন একটা শুকনো পাতাও না মাড়ানোর শব্দ হয়, পথের পাশের ঝোপঝাড়ে যেন একটুও কাঁপন না লাগে। পা ও হাত ফেলার আওয়াজ যেন নিজের কানেও না শোনা যায়।

একটা বাঁক আছে সামনে। বাঁকটার কাছে পৌঁছে আমি চুপ করে শুয়ে পড়লাম। কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম, কিছু শুনতে পাই কী না।

নাঃ, কোন শব্দই নেই। ঝর্নার ঝরঝর শব্দ ছাড়া। ঝর্নার ঐ পারে একটা নীল আর লালে মেশা ছোট্ট মাছরাঙা পাখি নদীর শুকনো বুকে একটা ভেসে আসা কাঠের উপর বসে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কী যেন দেখছিল আর মাঝে মাঝে আশ্চর্য দুঃখ দুঃখ গলায় ডাকছিল। হঠাৎ পাখিটা যেন ভীষণ ভয় পেয়ে সোজা উপরে উড়ে গেল জোরে ডাকতে ডাকতে।

আমাকে কি ও দেখতে পেল? নাঃ। আমাকে দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবে? কেন ও ভয় পেয়ে উড়ল? এই কথা ভাবছি, ঠিক এমন সময় জলের মধ্যে ছপ ছপ্ শব্দ শুনতে পেলাম। কোনো জানোয়ার জল মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে! কি জানোয়ার জানি না, কিন্তু জানোয়ারটা বাঁ দিক থেকে ডানদিকে হেঁটে আসছে। যে ভাবে শব্দটা এগিয়ে আসছে আর থামছে, তাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাছরাঙা পাখিটা যেখানে বসেছিল তার সামনে এসে পৌঁছবে জানোয়ারটা। কি জানোয়ার? হরিণ? শম্বর? শুয়োর? বাঘ?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম।

রাইফেলটাকে এগিয়ে দিয়ে কাঁধে তুলে নিলাম। কাঁধে তুলে নিয়ে মাছরাঙাটা যে ভেসে-আসা কাঠে বসেছিল, সেই কাঠে নিশানা নিলাম। যে জানোয়ারই হোক সে ঐ কাঠের সামনে এলেই আমি তাকে গুলি করতে পারব। কিন্তু

সেফটি-ক্যাচ অন্ করিনি। ঝর্নাটা এত কাছে, আমার থেকে দশ হাত দূরেও নয়; এখানে সেফটি-ক্যাচ অন্ করলেই শব্দ হবে। তাই এখন আর উপায় নেই।

খুব শক্ত করে ধরে রাখলাম রাইফেলটাকে, আর ডান হাতের বুড়ো আঙুল রাখলাম সেফটি-ক্যাচের উপরে, যাতে গুলি করতে হলে সেফটি-ক্যাচ ঠেলে সঙ্গে সঙ্গে নিশানা না-সরিয়েও গুলি করতে পারি।

আওয়াজটা আরো একবার হল। জানোয়ারটা আরো কিছুটা এসে থমকে দাঁড়াল। তারপরই জলে চাক্ চাক্ চাক্ চাক্ শব্দ শুনতে পেলাম।

আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে এলো। বাঘ!

এমন জোর শব্দ করে বাঘ ছাড়া আর কোনো জানোয়ার জল খায় না। রাইফেলের ব্যারেলের রিয়ার-সাইট আর ফ্রন্ট-সাইটের মধ্যে দিয়ে চেয়ে, স্মল্ অফ দ্যা বাটের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে দু চোখ খুলে আমি সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম।

জল-খাওয়া সেরে জানোয়ারটা আবার চলতে শুরু করল। এসে গেছে; এসে গেল।

তার পরমুহূর্তেই দেখলাম একটা বিরাট বাঘ। তার বুকে একটা প্রকাণ্ড রক্তাক্ত ক্ষত, সেখান থেকে তখনও রক্ত বেরিয়ে আসছে, বড় বড় হলদে সাদা লোমের সঙ্গে রক্ত আর জল মাখামাখি হয়ে গেছে।

বাঘটার মাথাটা যেই কাঠটার কাছে এল, আমি সেফটি-ক্যাচ অন্ করেই ট্রিগারে হাত দিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দে বাঘটা আমার দিকে মুখ ফেরাল। আর এক সেকেণ্ডও

দেরী না করে আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে জল ছিটিয়ে বাঘটা জলে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বোল্ট খুলে চেম্বারে নতুন গুলি এনে আমি সেই দিকে তাকালাম। দেখলাম, বাঘটা মাছরাঙা পাখিটা যেই কাঠে বসে ছিল, সেই কাঠেই হেলান দিয়ে যেন বসে পড়েছে। আর তার কান আর মাথার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

বাঘটার বসার ধরন দেখেই বুঝলাম যে ও আর উঠবে না। কিন্তু তবুও, যেহেতু আমি শুয়ে ছিলাম এবং যদি বাঘ চার্জ করে তবে হঠাৎ ঐ শোয়া অবস্থা থেকে ওঠা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে, তাই কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে আমি বাঘের বুক লক্ষ্য করে আরেকটি গুলি করলাম।

বাঘটা যেন একটু দুলে উঠেই ঝুলে গেল। যেন আর একটু আরাম করে কাঠটাতে হেলান দিল। ঠিক সেই সময় ঝর্নার বাঁ দিক থেকে অন্য একটি বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলো। গর্জনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উপরের ডালপালা ভেঙ্গে তাকে খুব জোরে উল্টোদিকে দৌড়ে যেতে শুনলাম।

আমার আর টেড-এর একটি সাংকেতিক ডাক ছিল জঙ্গলের। বৌ-কথা-কও পাখির ডাক। বাঘটা মরে গেছে জেনে এবং অন্য বাঘটা কাছাকাছি আছে জেনে আমি উঠে সুঁড়িপথ দিয়ে জঙ্গলের বাইরে এলাম। এসে ফাঁকা টাঁড়ে দাঁড়ালাম।

এই জায়গাটা ফাঁকা। যেদিক দিয়েই আক্রমণ আসুক না কেন, দেখা যাবে। তাই বাঁ হাতে রাইফেলটা ধরে ডান-

হাত মুখের কাছে নিয়ে আমি বার বার বৌ-কথা-কও পাখির ডাক ডাকতে লাগলাম।

আমি জানতাম যে, এত অল্প সময়ে টেড খুব বেশী দূরে যায়নি। তাছাড়া সে আমার রাইফেলের পরপর দুটি গুলির আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনেছে। তাই টেড অল্পক্ষণেরই মধ্যেই সাড়া দেবে।

অনেকবার ডেকেও আমি যখন টেডের সাড়া পেলাম না তখন চিন্তাতে পড়লাম। বাঘটা এদিকেই আছে। টেড মিছিমিছি পথে ঘুরে মরবে। টেড এলে আমরা দুজনে একসঙ্গে ঝর্নার ওপারে চলে-যাওয়া বাঘটাকে খুঁজলে তাড়াতাড়ি তার দেখা পেতে পারি।

মিনিট দশেক ওখানে দাঁড়িয়েও যখন টেডের সাড়া পেলাম না তখন মনে হল যে, টেড নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে।

একাই যাবো ভেবে যখন ঐদিকে ফিরে চলে যাচ্ছি। ঠিক সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে খুব জোরে কিছু একটা দৌড়ে আসছে শুনতে পেলাম। তারপরই আমার প্রায় কানের কাছেই গুড়ুম করে টেডের ভারী রাইফেলের আওয়াজ শুনলাম। এবং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে টেড ডানদিকের জঙ্গল থেকে এক লাফে ছিটকে বেরিয়েই দৌড়ে এল আমার দিকে। ওর চোখে মুখে ভয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি হল?

টেড জবাব দেওয়ার আগেই দেখি টেড যেখান থেকে জঙ্গল ফুঁড়ে বেরোল, সেইখান দিয়ে একটা প্রকাণ্ড শঙ্খচূড় সাপ জঙ্গল লণ্ডভণ্ড করে ফণা আর লেজ দিয়ে ঝোপঝাড় ভাঙ্গতে



ভাঙ্গতে আছড়াতে আছড়াতে টাঁড়ে বেরিয়ে এল।

আমি আমার রাইফেলটা টেডএর হাতে দিয়ে একটা লম্বা শুকনো কাঠ তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পরপর কয়েকটা বাড়ি মেরে তাকে ঠাণ্ডা করলাম।

রাইফেল দিয়ে সাপ মারার অসুবিধা অনেক। সাপ মারতে শটগান সবচেয়ে ভাল।

টেড মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছিল।

আমি ফিরে এসে বললাম, এত বড় শঙ্খচূড় কেউই বোধহয় দেখেনি কখনও।

টেড বলল, তোর গুলির শব্দ শুনেই আমি এদিকে দৌড়ে আসছিলাম। তারপর তুই যখন বৌ-কথা-কও পাখির ডাক দিলি, তখন দাঁড়িয়ে পড়ে সেই ডাকের উত্তর দেবো এমন সময় পেছনে শব্দ শুনে দেখি ঐ সাপটা ঝাটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমার পেছনে দৌড়ে আসছে।

তক্ষুনি গুলি করতে পারতাম। কিন্তু আমরা মানুষখেকো বাঘের পিছনে এসেছি, তাই গুলির আওয়াজে পাছে তারা সরে যায়, তাইই ভাবলাম, গুলি না করে দৌড়ে তোর কাছে এসে পৌঁছে যাই।

উরে ব্বাস্‌। একটু হলেই আজ খতম হয়ে গেছিলাম। শেষকালে যখন প্রায় আমাকে জঙ্গলের কিনারে এসে ধরে ফেলল এবং লেজের উপর সমস্ত শরীরটাকে তুলে আমার মাথা সমান লম্বা হয়ে উঠে একেবারে মাথায় ছোবল দেবার উপক্রম করল তখন রাইফেলের ব্যারেলটা প্রায় তার ফণাতেই ছুঁইয়ে, গুলি করেই লাফিয়ে টাঁড়ে এসে পড়লাম। গুলিটা

ফণাতে না লাগলে এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছিলাম আমি।

তারপর দম নিয়ে টেড বলল, তুই গুলি করেছিলি কেন? ডাকলিই বা কেন আমাকে? কিসে গুলি করলি?

আমি বললাম, টাঁড়বাঘোয়া এবং তার সঙ্গিনী দুজনেই এদিকেই আছে। তোকে উল্টোদিক থেকে ডেকে আনবার জন্য শীষ দিয়েছিলাম।

ও বলল, তা ত বুঝলাম। কিন্তু গুলি করলি কি দেখে?

বললাম, বাঘ দেখে!

টেড লাফিয়ে উঠল। বাঘ? কোথায়?

মিস্ করেছি। পালিয়ে গেছে। এবারে চল, ওদিকেই যাই।

মিস্ করলি? ঈস্স্।

তারপর বলল, চল্, এগোই। ঘড়িতে তখন আটটা বেজেছে। তখনও সময় আছে হাতে অনেক।

টেডকে সঙ্গে নিয়ে সুঁড়িপথ ধরে যখন আমি ঝর্নাটার পাশে এসে দাঁড়ালাম তখন বাঘটাকে দেখেই টেড রাইফেল তুললো।

আমি হাত দিয়ে ওর রাইফেলের ব্যারেল নামিয়ে দিয়ে বললাম, বেচারা অনেকক্ষণ হল মরে গেছে।

বাঘটার থাবার দিকে তাকিয়ে টেড চিৎকার করে উঠল, টাঁড়বাঘোয়া, টাঁড়বাঘোয়া বলে।

তারপরই আমার কান ধরে খুব করে মলে দিয়ে বলল, মিথ্যাবাদী, লায়ার, ইডিয়ট।

বলেই, আমাকে জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে।

আমি ওকে শান্ত করে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, অন্য বাঘটা

সামনেই গেছে। চুপ করে যা। চল্ এখন এগোই।

ঝর্নার পাশ দিয়েই আমরা উজানে চললাম। কিছুটা গিয়েই, যেখান থেকে বাঘিনীর আওয়াজ শুনেছিলাম সেখানে পৌঁছেই আমরা থম্‌কে দাঁড়ালাম।

ঝর্নার পারে, বালির মধ্যে একটা বড় কালো পাথরের উপর থেকে টিকায়েত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। টিকায়েত মানে, টিকায়েতের মুণ্ডুটা।

কেউ যেন দা দিয়ে কেটে পাথরে বসিয়ে রেখেছে সেটাকে। চোখ দুটো খোলা—ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয়ে টেডকে জড়িয়ে ধরলাম।

টেড বমি করার মত একটা শব্দ করল।

তারপর আমাকে হাত ধরে নিয়ে এগোল সামনে। একটু সামনেই নদীর পারে টিকায়েতের শরীরের দুটি অংশ দুদিকে পড়ে আছে। রক্ত, আর বালি আর সাদা লাল হাড়ের টুকরোতে, কাল বিকেলের ঘোড়ায় চড়া লম্বা-চওড়া লোকটার কথা ভেবেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল আমাদের।

ঝর্নাটা থেকে আমরা এখন প্রায় মাইলখানেক চলে এসেছি। এখানে জঙ্গল খুবই ঘন। এই সকালেও মনে হচ্ছে গভীর রাত। এমনই অন্ধকার ভিতরটা।

পুরো পথই আমরা ভিজে জায়গায় বাঘের পায়ের দাগ দেখে এসেছি। কিন্তু রক্ত কোথাও দেখিনি। আশ্চর্য! এখন নিচে এত ঝোপঝাড় এবং ঘন ঘাস যে পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা একটা দোলা মত। একটা বড় পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে ছায়ায় ছায়ায়। তাই এত গাছ পাতা ঘাস

এই গরমের সময়েও। নদীতে জলও রয়েছে এক হাঁটু মত। স্রোতও আছে।

টেড ফিসফিস করে বলল, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। বুদ্ধিও ভাঁজতে হবে,—এই বলে একটা বড় পাথরের উপর বসল টেড। আমিও বসলাম। কিন্তু উল্টো দিকে মুখ করে।

টেড বলল, এখন সাড়ে দশটা বাজে। এখানে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসি। ভালো করে শোন্ কোনো আওয়াজ শোনা যায় কি না। মিছিমিছি হেঁটে লাভ কি ?

ওয়াটার বটল থেকে একটু জল খেলাম আমরা।

টেড পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে আমার পিছনদিকে হাত ঘুরিয়ে আধখানা এগিয়ে দিল।

ঐ জায়গাটার একদিকে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বেশীর ভাগই খড়হি বাঁশ। দমকে দমকে হাওয়া উঠছে বনের মধ্যে আর বাঁশবনে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। কটকট্ করে আওয়াজ হচ্ছে বাঁশবন থেকে।

মিনিট দশেক ওখানে বসে থাকার পর হঠাৎ আমার ডানদিক থেকে ও টেডের বাঁদিকের ঘন জঙ্গল থেকে হুপ-হাপ করে হনুমানের ডাক শোনা গেল। মনে হল, কিছু একটা দেখে ওরা খুব উত্তেজিত হয়েছে। হনুমানগুলো আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার থেকে বড় জোর দুশো গজ দূরে ছিল।

আমরা কান খাড়া করে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, হনুমানগুলো ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করতে করতে ক্রমশঃ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ঘন-সবুজ পাতার

চাঁদোয়ার মধ্যে মধ্যে।

আমি আর টেড তাড়াতাড়ি কিন্তু নিঃশব্দে বড় পাথরটা থেকে নেমে তুটো পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসলাম। একটু পরই কোনো জানোয়ারকে ঝোপঝাড়ের ভিতরে আসতে শোনা গেল। এই জায়গাটা ভিজে থাকায়, শুকনো পাতা মাড়ানোর খচ্‌মচ্‌ আওয়াজ হচ্ছিল না।

একটু পরই সেই আওয়াজটা থেমে গেল। তারপর আবার আড়ালে আড়ালে আওয়াজটা ফিরে গেল। হনুমান-গুলোও এতক্ষণ টিকিট-না-কেটে র‍্যাম্পার্টে চড়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখার আনন্দে মশগুল সাপোর্টারদের মত চেচাঁমেচি লাফালাফি করছিল। গাছের মাথায় মাথায় ঐ আওয়াজটা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও চুপচাপ হয়ে গেল।

টেড বলল বাঘ কিংবা চিতা!

আমি বললাম, এ অঞ্চলে চিতা একটিও ছিল না, বলছিল বস্তীর লোকেরা।

তাহলে তাই হবে।

বাঘ হলে টাঁড়বাঘোয়ার সঙ্গিনী।

টেড বলল, সঙ্গিনী কিন্তু আহত হয়নি। তুই লক্ষ্য করেছিলি যে এতখানি পথের সব জায়গায় পায়ের চিহ্ন থাকলেও রক্ত কোথাওই আমরা দেখিনি।

তা ঠিক।

টিকায়েতের সঙ্গের লোকতুটো ভুলও দেখে থাকতে পারে, আমি বললাম।

টেড বলল, যদি এই বাঘিনী মানুষখেকো না হয় তবে তাকে কি আমাদের এখুনি মারা উচিত? মাচায় উঠে টিকায়েতকে মেরেছিল—তা স্বাভাবিক বাঘেও মারে। ওটা রাগের মার। যে গুলি করেছে বা ভয় দেখিয়েছে; তাকে শাস্তি দেওয়া আর মানুষখেকো হয়ে যাওয়া এক জিনিস নয়।

আমি বললাম, তা ঠিক। কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে এই বাঘিনীও মানুষখেকো?

তাহলে আমরা আবার ফিরে আসব। মহুয়ামিলনে পলাশবনার লোকেরা ইচ্ছে করলেই যেতে পারে। তাছাড়া কোলকাতার ঠিকানাও ওদের দিয়ে রাখব। ওরা খবর দিলেই আসব। কিন্তু আন্দাজে মানুষখেকো ভেবে বাঘিনীকে মারা আমার মনঃপূত নয়।

তারপর টেড আবার বলল, একটা কাজ কর। তুই জোরে গলা ছেড়ে গান গা। আমিও জোরে জোরে কথা বলব। যদি মানুষখেকো হয় তবে তাকে আমরা জানান দিয়ে এখান থেকে ফিরে চলি চল্। মানুষখেকো হলে, সে হয়ত আমাদের পিছু নেবে।

আমি বললাম, পেট ত ভর্তি। পিছু নাও নিতে পারে। তাছাড়া, গুলির শব্দ শোনার পরও দিনের বেলায় আমাদেব পিছু পিছু যাবেই যে, এমন কি কথা আছে?

টেড বলল, সেটাও ঠিক। তবুও আমার মন সায় দিচ্ছে না। চল্ আমরা ফিরে যাই আজ। তাছাড়া. টিকায়েতের শরীরের অংশ আর মাথাটা নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। দাহ করার জন্যে।

আমি বললাম, তা ঠিক! কিন্তু কি করে নেব? আমার যে ভাবতেই ভয় করছে।

টেড বলল, ওর ছেলেটার কথা ভাব। শরীরের কোনো অংশ না নিয়ে গেলে ত তোদের হিন্দুমতে মৃতের সৎকারই হবে না।

তা ঠিক।

টেড বলল, কি হল? গান গা।

আমি জোরে গাইতে লাগলাম :

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,

তাহার মাঝে আছে যে দেশ, সকল দেশের সেরা।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

টেড সঙ্গে শীব দিতে লাগল। আমরা কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে নজর রাখতে রাখতে আস্তে আস্তে ফিরতে লাগলাম।

আধ মাইল যাওয়ার পরও কোনো কিছু যে আমাদের পিছু নিয়েছে এমন বোঝা গেল না।

আরও আধ মাইল চলার পরও না।

টেড বলল, ত্থাখ্ আমার মন বলছে বাঘটা ভাল। দেখিস। ও রাগের মাথায় একটা খুন করে ফেললেও আর কখনও মানুষ খাবে না।

আমরা যখন টাঁড়বাঘোয়ার কাছে এসে পৌঁছলাম তখন দেখে আশ্চর্য হলাম যে তার গায়ে একটি তীরও যে লেগেছে এমন দাগ নেই। টেড আর আমি আমাদের জামা খুলে তার মধ্যে করে টিকায়েতের মাথা আর পেটের কিছুটা অংশ মুড়ে নিলাম। এবারেও টিকায়েতের মুখের দিকে তাকিয়ে

মনে হল, যেন টিকায়েত নীরব চোখে বলছে, বাজীতে হার হয়েছে আমার। ছেলেমানুষ তোমরাই জিতে গেলে।

টেড বলল, যদি তীর লাগার কথাটা মিথ্যা হয়, তাহলে বাঘিনী যে টিকায়েতের মাংস খেয়েছে, আধখানা মুখে করে নিয়ে গেছে এও মিথ্যা হতে পারে। চল্ ফিরে চল্। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করি। যদি আর কোনো অত্যাচার হয় গ্রামে তখন ত আমরা আছিই।

বেচারা টাঁড়বাঘোয়া!

তার কোনো দোষ ছিল না। সে এ গ্রামের প্রহরী ছিল। যদি না টিকায়েত তার থাবাটাকেই ভেঙ্গে দিত তাহলে সে বেচারার মানুষের ক্ষতি করার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না।

এখন দুপুর দেড়টা বাজে। ক্ষিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। গ্রামে ফিরে টাঁড়বাঘোয়াকে নিয়ে আসার, চামড়া ছাড়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে, টিকায়েতের সৎকারের সময় সামনে থাকতে হবে; এখন অনেক কাজ আমাদের।

আমি বললাম, চল্ টেড, যাওয়া যাক এবার।

টেড বলল, যাবি যাবি। মানুষখেকো বাঘ মারলি তুই। এই জায়গাটাতে একটু বসে থাকি। মিনিট দশেক জিরিয়ে নিই।

তারপর বলল, কি করে মারলি বল ত শুনি।

আমি বললাম, মানুষখেকো যদি টিকায়েতকে না মারতো তাহলে আজ সত্যিই আনন্দের দিন ছিল। মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, কিছুই আর ভাল লাগছে না।

টেড বলল, যা ঘটে গেছে এবং যে-সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র করণীয় নেই ; সেই আলোচনা করে লাভ কি ? বল্ ত তুই, কি করে মারলি, কোথায় দেখলি ওকে ? গুলি খেয়ে কি করল টাঁড়বাঘোয়া ?

টেড টাঁড়বাঘোয়ার দিকে মুখ করে নদীর বালিতে বসেছিল। আর আমি টাঁড়বাঘোয়ার পাশে একটা পাথরে।

টেডএর কথার উত্তরে আমি কথা বলব, ঠিক এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল টেডএর চোখে। টেডএর চোখ দুটো সজাগ হয়ে উঠেছে, কান উৎকর্ণ, টেড আমার পিছনের জঙ্গলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন কী দেখছে !

আমি ওর দিকে আবার তাকাতেই ও ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল আমাকে।

আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার রাইফেলটা আমার হাতে নেই। টেডএর পাশে একটা পাথরে রেখে এসেছিলাম রাইফেলটা।

টেডএর হাতে রাইফেল তার শক্ত মুঠিতে ধরা। ও আমার পায়ের দিকে মুখ করে আছে, আমাকেই দেখছে যেন, এমন ভাব করছে আসলে তাকিয়ে আছে আমার পিছনে।

হঠাৎ ঝর ঝর করে মাটি আর নুড়ি পাথর খসে পড়ার আওয়াজ হল আমার ঠিক পিছনে।

আমি বুঝলাম কোনো জানোয়ার আমার ঘাড়ে লাফাবার মতলব করছিল, কোনো কারণে সে পা পিছলে অথবা ইচ্ছে করে সরে গেছে।

টেড স্বাভাবিক গলায় বলল, আর চুপ করে থাকার দরকার

নেই। ভাব দেখা যেন কিছুই হয়নি। সেই গানটা গা-না, যেটা গাইছিলি একটু আগে।

আমার পিছনে নিশ্চয়ই বাঘিনী। হাতে রাইফেলও নেই। আর টেড গান গাইতে বলছে! কিন্তু নিরুপায় আমি। নিশ্চয়ই গান গাওয়াটাও এখন দরকার। তাই জোরে আবার গান ধরলাম আমি, 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা··· ।'

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ডানদিকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েই টেড আমার গায়ে যাতে গুলি না লাগে এমনভাবে রাইফেলটা কাঁধে তুলেই গুলি করল। গুলি করতেই, প্রচণ্ড হুংকার শুনলাম আমার পিছনের জঙ্গলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ওখান থেকে লাফিয়ে সামনে পড়ে আমার রাইফেলটা হাতে তুলে নিলাম।

টেড দৌড়ে উল্টোদিকের পাড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমিও দৌড়ে ওর ডানদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে রইলাম সেদিকে, যেদিক থেকে গর্জন করেছিল বাঘিনী। কিন্তু আমাদের আর খুঁজতে হল না তাকে। গাছপালা ঝোপঝাড় কামড়ে-আঁচড়ে ভেঙ্গে-চুরে মাটি পাথর সব উপড়ে ফেলে বাঘিনী যে কী প্রলয় উপস্থিত করলো তার বর্ণনা লিখতেও আজ এত বছর পরেও হাত ঘেমে উঠছে আমার।

টেডএর গুলি বাঘিনীর পিঠ আর পেটের মধ্যে মেরুদণ্ডে লেগেছিল। তবে তার গর্জন এবং যন্ত্রণা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। টেডএর হেভী রাইফেলের আর একটি গুলি ততক্ষণে তার

কাঁধ দিয়ে ঢুকে বুকের ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছিলো। আমার রাইফেলের একটি গুলি লেগেছিল তার মাথার পেছনে।

আমি যে জায়গাতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেখান থেকে মাথার পেছনটাই দেখা যাচ্ছিল শুধু।

বাঘিনী শান্ত হলো অনেকক্ষণ থর্ থর্ করে কেঁপে।

যাঁরাই নিজেরা গুলি করে কখনও কোনো জানোয়ার মেরেছেন, সে মানুষখেকো বাঘই হোক, আর যাইই হোক, তাঁরাই জানেন যে, সেই জানোয়ার যখন মারা যায় তখন বড় কষ্ট হয়। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আসে। কিন্তু এবারে আমাদের টাঁড়বাঘোয়া আর তার সঙ্গিনীকে না মেরে উপায় ছিলো না।

টেড ধেই ধেই করে লাফাতে লাগল, 'ঢানা ঢাম্মে ফুক্কে বারা আমাডের বণ্ডুগুরা' বলে গান গাইতে গাইতে।

আমি বললাম, কী সাংঘাতিক চালাক দেখেছিস বাঘিনী। একটু হলে ত আমাকে খেয়েই ফেলত!

টেড বলল, চালাকেরও বাবা থাকে। বাঘিনী আমাদের কোথা থেকে ফলো করছিল বল ত?

কোথা থেকে?

সেই যেখানে হনুমানরা ফিরে গেল, আমরা ভাবলাম, জানোয়ারটাও ফিরে গেল, সেইখান থেকে। ওটা ওর একটা কায়দা। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিলো। তোকে কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম, সময় মত বলব। কিন্তু যে বাঘিনী অতগুলো গুলির শব্দ শোনার পরও ভর দুপুরে দু দুজন

শিকারীকে এতখানি ফলো করে আসে সে নতুন নয়। এখন আমার মনে হচ্ছে কি জানিস? মনে হচ্ছে টাঁড়বাঘোয়া একটি মানুষও খায়নি। সবই এই বাঘিনীর কাজ। তা না হলে ছাখ্ টিকায়েতের গুলি ত খেয়েছিল সে গত বছর গরমের সময়। এই গত একবছরে একজনকেও সে ধরল না কেন?

ভাববার মত কথা, আমি বললাম।

তারপর বললাম, আমরা দুজনেই ত সমান অথরিটি। তার চেয়ে চল্, কোলকাতায় ফিরে ঋজুদাকে ভাল করে সব বলে ব্যাপারটা আসলে কি তা জিজ্ঞেস করব।

টেড বলল, নট্ আ ব্যাড আইডিয়া।

তারপর বলল, আর এখানে নয়। এবার তাড়াতাড়ি ফেরা যাক। অনেক কাজ বাকি আমাদের; গ্রামের লোকদের।

আমি বললাম, টিকায়েতের সঙ্গী দুজনকে ধরে ঠ্যাঙাব কিন্তু আমি। মিথ্যুক পাজী লোকগুলো।

টেড বলল, ওদের ঠ্যাঙানোই উচিত।

যে জায়গাটা দিয়ে আমরা তখন যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটা খুব উঁচু।

ওখানে দাঁড়িয়ে দারুণ দেখাচ্ছিল নিচের পলাশে পলাশে লাল-হয়ে-যাওয়া পলাশবনা বস্তী, তার আশেপাশের জঙ্গল আর টাঁড়কে; দুপুরের আলোতে।

আঁধি উঠছে। ধুলোর মেঘের আস্তরণে ছেয়ে গেছে চারদিক। রুখু হাওয়ায় নাক চোখ জ্বালা জ্বালা করে। অথচ ভালোও লাগে। দমক্ দমক্ হাওয়ায় মহুয়া করৌঞ্জ

আর নানা ফুলের মিশ্র গন্ধ ভেসে ভেসে আসছে ছুটোছুটি করে, মনে হচ্ছে যেন কোনো খেলায় মেতেছে ওরা ; কে কার আগে এসে পৌঁছবে।

গরু চরছে বস্তীর মাঠে, প্রান্তরে, মুরগী ছাগল ডাকছে। আটার কলে গম পেষাই হচ্ছে, তার পুপ্ পুপ্ পুপ্ পুপ্ আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে হাওয়াতে। লালরঙা হনুমান ঝাণ্ডা উড়ছে অশ্বত্থ গাছের মগডাল থেকে। রুক্ষ উদাস প্রকৃতি, বড় গরীব কিন্তু বড় ভালো মানুষজন; কী শান্তি চারদিকে!

চলতে চলতে নিচে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, বন-পাহাড় ঘেরা এই শান্তির বস্তী পলাশবনাতে দুজন রাজা ছিলো। একজন টিকায়েত। আর অন্যজন টাঁড়বাঘোয়া। যদিও একেবারেই আলাদা ছিলো তাদের রাজত্বের রকম, তাদের প্রজাদের চেহারা। তাদের চরিত্র। কিন্তু এই দুই রাজার মধ্যে সত্যিকারের কোনো ঝগড়া ছিলো না। দুজনেই দুজনকে চিরদিন সমীহ করে চলত। ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই এই দুপুরে তারা দুজনেই এক মর্মান্তিক ঝগড়ার পরিণতির শিকার হয়ে জঙ্গলের মধ্যের এক অনামা নদীর ঝর্নার পাশে শুয়ে রয়েছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে, বালিতে পাথরে, জলে মাটিতে; রোদে ছায়ায়।

একই সঙ্গে।

টেড আমার আগে আগে চলছিল।

আমি টেডকে বললাম, আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, সমস্ত ঝগড়া, যতরকম ঝগড়া হয়, হয়েছে আজ পর্যন্ত

এবং হবে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে এবং একদিন হয়ত এক গ্রহের সঙ্গে অন্য গ্রহের, সেই সমস্ত ঝগড়ার পিছনেই একটিই মাত্র কারণ থাকে ; ভুল বোঝাবুঝি।

ভারী দুঃখের। তাই না ?

টেড এখন কোনো কথাই শুনতে রাজী নয়। ও ওর রাইফেলটা বাঁ কাঁধে ফেলে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বড় বড় পা ফেলে গান গাইতে গাইতে এগোচ্ছিল—'ঢন ঢান্নে ফুস্ফে বারা আমাডের বশুগুরা।...'

—